ইসলামের ইতিহাসে যুদ্ধ

নববী যুগ থেকে বর্তমান

সাদিক ফারহান

মাকতাবাতুল আসলাফ

ভেতরের পাতায়

সংকলকের কথা ৯

নববি যুগ

বদর যুদ্ধ ১৯
উহুদ যুদ্ধ ৩৬
খন্দক যুদ্ধ ৫৩
হুদাইবিয়ার যুগান্তকারী সন্ধি ৬৭
খাইবার যুদ্ধ ৯০
মক্কা বিজয় ১০৯
হুনাইনের যুদ্ধ ১২২
মুতার যুদ্ধ ১৩১
তাবুকের যুদ্ধ ১৪৩

খিলাফতে রাশিদা

যাতুস সালাসিল ১৬৩
ওয়ালাজার যুদ্ধ ১৭২
আইন আত-তামর যুদ্ধ ১৮০
দাওমাতুল জান্দাল যুদ্ধ ১৮৫
আজনাদাইন যুদ্ধ ১৯২
সেতুর যুদ্ধ ১৯৯
বুওয়াইবের যুদ্ধ ২১৪
কাদিসিয়ার যুদ্ধ ২১৯
দামেশক বিজয় ২২৯
ইয়ারমুকের যুদ্ধ ২৩৫

নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ ২৫৬

উমাইয়া খিলাফত

দেবল এবং সিন্ধু বিজয় ২৬৬
ওয়াদি বারবাতের যুদ্ধ ২৭৮
টুরসের যুদ্ধ ২৯০

আব্বাসি খিলাফত

তালাস নদীর যুদ্ধ ৩০১
আম্মুরিয়ার যুদ্ধ ৩১২
সোমনাথ অভিযান ৩২৩
মানজিকার্টের যুদ্ধ ৩৩৭

আন্দালুসের যুগ

যাল্লাকার যুদ্ধ ৩৫০
আর্কের যুদ্ধ ৩৬৫
লাস নাভাস ডি টলোসা ৩৭৪

আইয়ুবি যুগ

হিত্তিনের যুদ্ধ ৩৮৫
বাইতুল মাকদিস বিজয় ৪০৬

মামলুক যুগ

আইন জালুতের যুদ্ধ ৪১৫
অ্যাক্রে বিজয় ৪৩৪

উসমানি যুগ

কসোভো যুদ্ধ ৪৪৩
নিকোপলিসের যুদ্ধ ৪৫৩
আঙ্কারার যুদ্ধ ও তৈমুর লং ৪৬৫

ভার্নার যুদ্ধ ৪৮০
কন্সটান্টিনোপল বিজয়.....৪৮৮
মোহাক্সের যুদ্ধ ৫০০
লেপান্টের যুদ্ধ..... ৫১০
ওয়াদি-আল-মাখাযিন যুদ্ধ ৫১৮
ভিয়েনার যুদ্ধ ৫২৯
ফ্রেজারের আক্রমণ এবং রশিদের যুদ্ধ ৫৩৭
নাভারিনোর যুদ্ধ ৫৪২

যাতুস সালাসিল

Battle of Chains

তারিখ:	১২তম হিজরি / ৬৩৩ খ্রি.
স্থান:	কুয়েত
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	খিলাফতে রাশিদা	পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ	হরমুজ
সেনাসংখ্যা:	১৮ হাজার	৮০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	১ হাজার শহিদ	৩০ হাজার নিহত

ইতিহাসের অপরাজেয় সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে ১২তম হিজরি মোতাবেক ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের বাহিনী ও মুসলিম সেনাদের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধকেই 'যাতুস সালাসিল' বা Battle of Chains বলা হয়। এ যুদ্ধে পারস্যবাহিনীর সঞ্চালনায় ছিল হিংস্র সেনাপতি হরমুজ। মুসলমানদের অবিস্মরণীয় বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধটি সমাপ্ত হয়।

যুদ্ধের প্রাকালাপ

ইরাক বিজয়ের সূচনা হিসেবে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দৃষ্টি ছিল 'আল-আবেলাহ' (Al Abelah) শহরটি দখল করার প্রতি। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে এ শহরের ভৌগলিক এবং সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কেননা, এ-শহরটিই ছিল আরবের সাথে পারস্যের নৌ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। শহরটির সাগর উপকূল ব্যবহার করেই ইরাকে ছড়িয়ে থাকা পারস্যের ঘাঁটিগুলোতে সবধরনের সাহায্য পৌঁছানো হতো। সে-সময় এ শহরের দায়িত্বভার ছিল উচ্চপদস্থ পারসিক আমির, প্রসিদ্ধ সেনাপতি হরমুজের হাতে। বর্তমানেও আরব উপদ্বীপের উপকূলীয় একটি শহরের নাম রয়েছে এই হরমুজের নামে। হরমুজ ছিল প্রচণ্ড অহংকারী এবং হিংস্র প্রকৃতির লোক। ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি—এমনকি পুরো আরব জাতীয়তার প্রতি—তার ছিল সীমাহীন ক্ষোভ। তেমনি আরবরাও সে-সময় ইরাকবাসীদের প্রতি নানা কারণে হয়ে উঠেছিল বীতশ্রদ্ধ; তারা সমাজে এদের উপমা দিয়ে বলতো:'এরা তো দেখি হরমুজের চেয়েও বড় কাফের, হরমুজের চেয়েও নিকৃষ্ট।'

খলিফার কাছে সেনা সাহায্য তলবের পর সর্বমোট ১৮ হাজার সদস্যের মুসলিম বাহিনী নিয়ে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সেখানে পৌঁছে প্রতিপক্ষ দলের

নেতা হরমুজের বরাবর একটি চিঠি লিখলেন। যেখানে তিনি ইসলামে জিহাদের বাস্তবতা কী, তার স্পষ্ট বিবরণ দিলেন। উত্তম ভাষা ও উপস্থাপনায় বর্ণনা করলেন মুসলিম সেনাবাহিনীর বিশেষ গুণাগুণ। তিনি বললেন:

'ইসলাম গ্রহণ করে নিন, নিরাপদ হয়ে যাবেন; অথবা নিজের ও স্বজাতির জন্য জিম্মি চুক্তি মেনে নিন এবং মুসলমানদেরকে জিযিয়া কর প্রদানে সম্মত হয়ে যান—নতুবা সবকিছুর জন্য নিজেকেই তিরস্কার করতে হবে আপনার। কারণ, আমি এমন এক জাতি নিয়ে এসেছি, যারা মৃত্যুতে ততটা ভালোবাসে, যতটা আপনারা জীবনকে ভালোবাসেন।'

মুসলিম বাহিনীর চরিত্র-স্বভাবের এরচেয়ে সত্য চিত্রায়ন আর কী হতে পারে? এই স্বভাব ও মানসিকতার কারণেই তো ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদেরকে এতটা ভয় করত। এটাই মুসলমানদের হৃদয়োত্থিত উর্ধ্বগামী সুবাস, সুরভি। সেই মুসলিম বাহিনীর মৃত্যুপ্রেম আজ বদলে গেছে ভীরুতায়, দুর্বলতায় আর দুনিয়ার প্রতি লালসায়; অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, এই দুনিয়াসক্তির কারণেই পৃথিবীর তাবৎ কুফুরি শক্তি একযোগে আমাদের উপর হামলে পড়ছে। সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে তিনি স্পষ্ট ইরশাদ করেছেন: 'খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই কাফেররা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বলল, 'সেদিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে?' তিনি বললেন: 'তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের প্রভাব দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ভরে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, 'ওয়াহন' কী?' তিনি বললেন: 'দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং মৃত্যুর প্রতি বিতৃষ্ণা।'[১]

[১] *আবু দাউদ*: ৪২৯৭, *মুসনাদে আহমাদ*: ২২৪৫০, শাইখ শুয়াইব আরনাউত বলেন: হাদিসটির সনদ হাসান পর্যায়ের। ইমাম হাইসামি বলেন: এ-হাদিসের *মুসনাদে আহমাদের* সনদটি উত্তম। দেখুন: *মাজমাউয যাওয়ায়েদ*, হাদিস নং—১২২৪৪। এছাড়া শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন; দেখুন: *আস-সিলসিলাতুস সাহিহা*, হাদিস নং—৯৫৮

শেকড়ছেঁড়া যুদ্ধ

মুসলিম সেনাপতির প্রেরিত পত্রের 'ইসলাম বা জিযিয়া প্রদানের দাওয়াত' গ্রহণ না করে ছুড়ে মারল হরমুজ। নিজের হাতে ডেকে আনল স্বজাতির সর্বনাশ। পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দূত রওনা করল সে। ঘটনা শোনামাত্রই কিসরা বিরাট রণসাহায্য পাঠিয়ে দিল হরমুজ বরাবর। অল্প সময়ের মধ্যেই হরমুজের অধীনে জড়ো হলো বিপুল অস্ত্রবাহী বিশাল সেনাদল। হরমুজ তার পুরো যুদ্ধপরিকল্পনা করল 'কাজমা' (Kazma) শহরকে কেন্দ্র করে; কারণ, সে ভেবেছিল মুসলমানরা এখানটাতেই সেনা জমায়েত করবে। কিন্তু সে মুসলিম সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের চৌকস সামরিক বুদ্ধিমত্তার কাছে হোঁচট খেয়ে গেল। তিনি আধুনিক যুদ্ধবিদ্যামতে 'লয় ও ক্ষয়ের যুদ্ধ' বা War of Attrition-এর পথ বেছে নিলেন। পারস্য বাহিনীকে নিয়ে তিনি কঠোর পরিকল্পনা করলেন। সে-মতে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন 'হাফির' অঞ্চলে। এদিকে হরমুজ তার সেনাদল নিয়ে কাজমা শহরে এসে দেখে, সেখানে কেউ নেই। গুপ্তচররা তাকে জানাল, মুসলমানরা হাফিরের দিকে গেছে। এ-খবর শুনে বিকল্প পথে সে দ্রুত হাফিরের পথ ধরল, যাতে মুসলমানদের আগে পৌঁছানো যায়। ঘটলও তাই, মুসলমানদের আগে সে হাফিরে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়েই সে যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করল; চারপাশে গভীর পরিখা খনন করতে করতে তার সেনারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু বীর সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ততক্ষণে শত্রুদের অবস্থান জানতে পেরে মুসলিম বাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে নিলেন। তাদেরকে নিয়ে পুনরায় চলে গেলেন কাজমা শহরে। সেখানে সেনাতাঁবু স্থাপন করলেন এবং এ-সুযোগে যুদ্ধের পূর্বে সেনারা খানিক বিশ্রাম করারও সুযোগ পেয়ে গেল।

মুসলিম বাহিনীর কাজমা ফিরে যাওয়ার সংবাদ এল হরমুজের কাছে। ক্রোধে তার কান লাল হয়ে গেল, তার ললাটের ভাঁজে ভাঁজে জমে গেল দুঃশ্চিন্তা। অগত্যা সে তার ক্লান্ত শ্রান্ত বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের জন্য পুনরায় কাজমার পথ ধরল। তবে সে এলাকার ভূমি-প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের চেয়ে স্থানীয় পারসিকদের জানাশোনা ছিল বেশি। ফলে পরবর্তীতে এলেও হরমুজ ময়দানের পার্শ্ববর্তী পানির উৎসগুলো দখল করে নিল; ফোরাত নদীকে পেছনে রেখে সে ময়দানে এসে হাজির হলো, যাতে মুসলমানরা পানির প্রয়োজনে ফোরাতে যেতে না পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর পবিত্র গ্রন্থে সত্য

বলেছেন:

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا

> *'কখনো তোমাদের কাছে কোনো কিছু অপছন্দ লাগে, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।'*[১]

শত্রুপক্ষকর্তৃক ময়দানের সুবিধা দখল মুসলমানদের ভেতর আত্মমর্যাদার আগুন জ্বেলে দেয়; তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আরও উৎসাহী এবং উদ্যমী হয়ে ওঠে। এ-সময় সেনাদের উদ্বুদ্ধ করতে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'তোমরা কি ময়দানে তোমাদের ঘোড়াগুলো নামিয়ে দেবে না? আল্লাহর অস্তিত্বের শপথ, পানির ঝরনাগুলো তাদেরই অধিকারে আসবে, দুপক্ষের যারা হবে সবচে ধৈর্যশীল এবং সবচে সম্মানিত।'

পারসিক বাহিনীপ্রধান হরমুজ মুসলিম সেনাদের সাথে ময়দানি মোকাবেলায় নামার আগে পরিস্থিতির বিবরণ জানিয়ে সম্রাট কিসরার কাছে আরেকটি চিঠি লিখে পাঠাল। সে তৎক্ষণাৎ কারিন ইবনু কিরবাসের নেতৃত্ব আরেকটি বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দিল, যাতে ঘটনাক্রমে হরমুজ মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলেও এই বিকল্প বাহিনী যেন আবলেহ শহরটি তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ, আমরা পূর্বেও বলেছি—শহরটি এতদাঞ্চলে পারস্য প্রভাব জিইয়ে রাখতে সার্বিক বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মৃত্যুর শেকল

পারস্য বাহিনীর সেনাপতি হরমুজ ছিল প্রচণ্ড অহংকারী এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন হঠকারী একজন মানুষ। সে কেবল নিজের কথা ভাবত, নিজের স্বার্থের চিন্তা করত। এমনকি, নিজের মোকাবেলায় সে বাহিনীর বৃহৎ স্বার্থ বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করত না। এবারও সে তা-ই করল, সে পারস্য বাহিনীর প্রত্যেক সেনাকে জোর করে শেকলাবদ্ধ করে ফেলল, যাতে যুদ্ধ যত ভয়াবহই হোক—মৃত্যু পর্যন্ত যেন কেউ যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করতে না পারে। তার এমন অপরিণামদর্শী কাজের দিকে সম্বন্ধ করে, ইতিহাসে এ-যুদ্ধকে 'যাতুস সালাসিল' ব্যাটল অফ চেইন বা শেকলের যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

[১] সুরা বাকারা: ২০১

সে-সময়ের যুদ্ধের স্বাভাবিক রীতিমতো প্রথমে দুই সেনাপতির মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে যুদ্ধ শুরু হলো। মহান মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের মোকাবেলার জন্য পারস্যদলের প্রধান হরমুজ ময়দানে নেমে এল। কিন্তু হরমুজ ছিল প্রচণ্ড ধূর্ত এবং বিশ্বাসঘাতক। সে একদল অশ্বারোহীকে বলে এল, দুই সেনাপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলাকালে অতর্কিত যেন তারা খালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর এরপরই যাতে মুসলমানদের সাথে কাফেরদের এলোপাতাড়ি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

দুই সেনাপতি তখন রণাঙ্গনে। খালিদ তো সেই সেনাপতি, ইসলাম গ্রহণের পূর্বাপর কোনো যুদ্ধেই—একটি বারের জন্যও জীবনে যে কোনো মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়নি। পেছনে ফাঁদ পাতা হরমুজের অশ্বারোহীরা খালিদের উপর হামলে পড়ার আগেই মুসলিম শিবিরের অন্যতম আরেক বীর মুজাহিদ কাকা ইবনু আমর আত-তামিমি—বীরত্ব ও সাহসিকতায় তিনি খালিদের সমকক্ষ ছিলেন—ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। দ্রুত তিনি সেনাদের সারি থেকে বের হয়ে হিংস্র সিংহের মতো গাদ্দার সে-সব অশ্বারোহীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ততক্ষণে হরমুজের ইহকাল সাঙ্গ করে দিলেন, চূড়ান্ত আঘাত হেনে ভেড়া জবেহ করার মতো তার গলার উপর তরবারি চালিয়ে দিলেন। এ অবস্থা দেখে পারস্য বাহিনীর চোখ কপালে উঠে গেল, তাদের ঐক্য ভেঙে গেল এবং সেনাপতির মৃত্যুতে বাহিনী চরম বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। আক্রমণের চিন্তা বাদ দিয়ে তারা দিগ্বিদিকশূন্য হয়ে পালাতে শুরু করল। মুসলমানরা ঘোড়া হাঁকিয়ে তাদের পেছনে ছুটলেন। সেখানেই তারা তিরিশ হাজারোর্ধ্ব অগ্নিপূজারিকে জাহান্নামে পৌঁছে দিলেন। অনেকে ডুবে গেল ফোরাতের পানিতে, শেকল ছিঁড়ে যারা পালাতে পারে নি—সেনাপতির নির্বুদ্ধিতার কৈফিয়ত হিসেবে তাদেরকে সেখানেই চূড়ান্ত বলি হতে হলো। বাকি সেনারা কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ময়দানের ভরাডুবি সয়ে সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে গেল। শোচনীয় এ পরাজয়ের জোয়ার কুফুরি শক্তি এবং অগ্নিপূজারি শিবিরের কোনায় কোনায় মুসলমানদের ভীতি পৌঁছে দিল।

ভয়াবহ ভীতির প্রসার

এ যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা তখনও শেষ হয়নি; আবলেহ শহরটি তখনও মুসলমানদের হাতে আসেনি। তাছাড়া সেখানেও এক শক্তিশালী রক্ষীবাহিনী অপেক্ষমাণ, হরমুজের পরাজয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে শহর বাঁচানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। হরমুজের তো ভরাডুবি হয়েছে, পরাজয়ের গ্লানি ও প্রভাব গায়ে মেখে পালিয়ে আসা

বাহিনীর বাকিরা তখনও ভয়াবহ এ পরাজয়ের শোকে শোকার্ত হয়ে আছে। তাদের মনস্তত্ত্বে চেপে রয়েছে প্রচণ্ড ভয় ও সংশয়। এই ভয় ও গ্লানি নিয়েই তারা যোগ হয়েছে কারিন ইবনু কিরবাসের দায়িত্বে থাকা আবলেহ শহরের রক্ষীবাহিনীতে। পালিয়ে আসা সেনারা কারিনের কানেও পরিস্থিতির নাজুকতার খবর জানিয়েছে, ফলে এ সেনাপতির মনেও জমে উঠেছে মুসলমানদের সম্মুখ-মোকাবেলার প্রচণ্ড ভয় ও দুশ্চিন্তা।

কিন্তু তারপরও, পারস্য সম্রাটের হুকুম মানার তাগিদে একরকম বাধ্য হয়েই তাকে মুসলিম বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য শহরের বাইরে 'মিযার' নামক স্থানে নেমে আসতে হয়। সে যুদ্ধের জন্য এ অঞ্চল বেছে নিয়েছিল, যাতে ফোরাত নদীর প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তদুপরি সে বিরাট এক নৌবহর তৈরি রেখেছিল, পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠলে যেন নদীপথে পালিয়ে যাওয়া যায়—সে জন্য। এদিকে হরমুজের অবশিষ্ট বাহিনী নিজেদের জন্য শহরের ভেতরে থেকে আত্মরক্ষাকেই উত্তম বলে ভেবে নিয়েছে। কারণ, তারা ময়দানে মুসলমানদের মোকাবেলা করা কতটা কঠিন, তা স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

মুসলমানদের বীর সেনাপতি হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সবসময় প্রতিপক্ষের প্রতিটা কাজের তদন্ত ও অনুসন্ধানকেই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র বলে হিসেব করতেন। মুসলিম পক্ষের গুপ্তচরদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন, পারস্যের আরেক বাহিনী মিযার নামক স্থানে একত্র হচ্ছে। এ-সংবাদ পাওয়ামাত্রই খালিদ মুসলিম বিশ্বের খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে পত্র পাঠান এ মর্মে যে, তারা অচিরেই মিযারে সেখানকার পারস্য বাহিনীর মোকাবেলার জন্যে আরেকটি যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে, যাতে এর মাধ্যমে আবলেহ দখলের পথ সুগম হয়। এরপর তিনি দ্রুত প্রতিপক্ষের সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করেন। ইরাকের সিংহ হযরত মুসান্না ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে একদল দক্ষ অশ্বারোহীকে তিনি অগ্রে প্রেরণ করেন এবং এত দ্রুত মুসলিম বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান, যা শত্রুপক্ষ একদমই চিন্তা করতে পারেনি। মুসলমানদের ক্ষিপ্রতা দেখে তারা দিশেহারা হয়ে গেল।

সামরিক বুদ্ধিমত্তা

মিযার অঞ্চলে পৌঁছেই দিগ্বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ প্রতিপক্ষের সেনাবাহিনীতে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেন। দীর্ঘ সামরিক অভিজ্ঞতা এবং সুক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা খাটিয়ে তিনি অনুধাবন করে নেন, শত্রুপক্ষের সেনাদের হৃদয় ভরে আছে মুসলিম বাহিনীর ভয়। কারণ, ঘাড় কাত করেই তিনি দেখতে পান ফোরাতের পাড়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নোঙর করে আছে বড় বড় নৌ জাহাজ। এটা দেখে তিনি মুসলিম বাহিনীর দিকে ঘুরে তাদেরকে যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করার এবং অবিচল থাকার নির্দেশ দেন। বলেন, পেছনে ফেরা ছাড়াই যেন সবাই সামনে অগ্রসর হয়! পারসিকদের সেনাসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার। এদিকে মুসলমানদের সেনা ছিল মাত্র ১৮ হাজার। তবে দুপক্ষের শক্তির মূল পরিমাপক ছিল দক্ষ ঘোড়সওয়ারের আনুপাতিক হার।

প্রথমেই ময়দানে বেরিয়ে এল পারস্যের সেনাপতি কারিন। সে ছিল দক্ষ ও সাহসী যোদ্ধা। ময়দানে পা রেখেই মুখোমুখি মোকাবেলার জন্য কোনো মুসলমানকে বের হয়ে আসতে আহ্বান করল কারিন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে একসাথে ময়দানে নেমে এলেন দুজন, সেনাপতি খালিদ এবং অখ্যাত এক আরব বেদুইন। ইতিহাসে যার নাম লেখা হয় মাকিল ইবনু আল-আশা, যার উপাধি ছিল 'শুভ্র অশ্বারোহী'। বেদুইন এই সাহসী সেনা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে পেছনে ফেলে ময়দানে বেরিয়ে যায় আগে। বাজপাখির মতো সে কারিনের উপর হামলে পড়ে এবং চোখের পলকেই তাকে হত্যা করে ফেলে। এরপর পারস্যের বাহিনী থেকে একসাথে কয়েকজন সাহসী যোদ্ধা এবং নেতাগোছের সেনারা বেরিয়ে আসে ময়দানে। মুসলমানদের মধ্য থেকে আসেম ইবনু আমর মোকাবেলা করেন পারস্য সেনাপতি আনোশজানের, মুহূর্তেই তিনি তাকে ওপারে পৌঁছে দেন। এরপর সাহাবি আদি ইবনু হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হন প্রতিপক্ষের সেনাপতি কাভাডের বিরুদ্ধে, কয়েক মিনিটে তাকেও তিনি পরপারের টিকেট ধরিয়ে দেন। এভাবে পারস্য সেনারা নেতা ও নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।

এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, নেতাদের কল্লা পড়ে যাবার পর পারস্যের সাধারণ সেনারা দ্রত ময়দান ত্যাগ করবে; তাদের সামরিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের ভেতরে মুসলমানদের জন্য জমে ছিল প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ক্রোধ। পুষে রাখা সেই ঘৃণা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তারা মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। নিজেদের

সর্বোচ্চ দিয়ে তারা মুসলিম বাহিনীকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু শেষপর্যন্ত মুসলমানদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণে তারা পদপিষ্ট হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনীর পদ চুম্বন করল স্পষ্ট বিজয়। তারা গুরুত্বপূর্ণ শহর আবলেহ দখল করে নিল। যার ফলে ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষমতা চলে এল মুসলমানদের হাতে। তেমনি সাগর উপকূলের অধিকাংশ জরুরি বন্দর এলাকার নিয়ন্ত্রণ চলে এল খিলাফতের নিয়ন্ত্রণে। তবে এ বিজয় ইরাকের মাটিতে পারস্যের সাথে মুসলমানদের ভয়ঙ্কর কিছু যুদ্ধের দ্বার খুলে দিল। যে যুদ্ধগুলোর সবকটিতেই বিজয় সঙ্গী হয়েছে মুসলমানদের এবং এতদাঞ্চলে অগ্নিপূজারি শয়তানদের রাজত্বের যবনিকাপাত ঘটেছে।

তালাস নদীর যুদ্ধ

Battle of Talas

তারিখ:	১৩৩ হিজরি / ৭৫১ খ্রি.
স্থান:	তালাস (বর্তমান কিরগিজিস্তানের অন্তর্গত একটি শহর)
ফলাফল:	চৈনিকদের পরাজয় এবং গাও শিয়ানশির পলায়ন

পক্ষ-বিপক্ষ:	আব্বাসি খিলাফাহ	চিনের ট্যাং রাজবংশ
সেনাপ্রধান:	যিয়াদ ইবনু সালিহ, আবু মুসলিম	গাও শিয়ানশি
সেনাসংখ্যা:	জানা যায় নি	৩০ হাজার, মতান্তরে ১ লক্ষ
ক্ষয়ক্ষতি:	অজ্ঞাত	নিহত কয়েক হাজার, বন্দি ২০ হাজারের মতো

কাগজের জন্ম কোন দেশে, এমন প্রশ্নের জবাবে আমরা সকলে একবাক্যে বলি—চিনে। সভ্যতার গতিপথ বদলে দেওয়া অনন্য এই আবিষ্কারের জন্য আজও বিশ্বসভ্যতা চৈনিকদের কাছে ঋণী। তবে আবিষ্কারের সাথে সাথেই কাগজের প্রযুক্তি বিশ্ববাসী জানতে পারেনি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, বহিঃবিশ্ব থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখতে সর্বদা আগ্রহী চিনারা কাগজ তৈরির নিগূঢ় রহস্য গোপন করে রাখতে পেরেছিল প্রায় আটশ বছর! কিন্তু হঠাৎ একদিন চিনের এই টপ সিক্রেট জেনে যায় সারাবিশ্ব। অবশ্য সেটা কোনো শান্তিপূর্ণ কনফারেন্সের মাধ্যমে নয়, বরং রীতিমত এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন বাঁকের সূচনা করা এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'ব্যাটেল অফ তালাস রিভার' বা 'তালাস নদীর যুদ্ধ' হিসেবে পরিচিত। ১৩৩ হিজরি মোতাবেক ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান কিরগিজিস্তানের অন্তর্গত তালাস নদীর অববাহিকায় আরবদের সাথে চিনদের প্রথম এবং একইসাথে শেষ এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়। ফলাফলে চৈনিক বাহিনীর উপর মুসলিম সেনাদের বিজয়, মধ্য এশিয়ায় আব্বাসি খিলাফাহর শেকড় আরও শক্তিশালী করে দেয়।

পূর্বকথা

সময়টা অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি। চিনের ট্যাং রাজবংশ (৬১৮-৯০৬ খ্রি.) তখন পূর্বদিকের একচ্ছত্র অধিপতি। একে একে মধ্য এশিয়ার তুর্কি রাজ্যগুলো চলে আসছিল তাদের করায়ত্তে। পরপর ধারাবাহিকভাবে তারা দখল করে নিচ্ছিল বর্তমান উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান এবং কিরগিজিস্তানের মতো বড় বড় প্রাচীন রাজ্যগুলো। চিনা সরকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কর না দিয়ে রাষ্ট্র বাঁচানোর কোনো উপায় তখন এদের সামনে খোলা নেই।

এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে জেগে উঠেছে ইসলামি খেলাফত। হযরত উমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের সময় (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য জয় করে মধ্য এশিয়ার উপকণ্ঠে পৌঁছে গিয়েছিল মুসলিম বাহিনী। তাঁর মৃত্যুপরবর্তী একশো বছর অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদিন (৬৪৪-৬৬১ খ্রি.) এবং উমাইয়া আমলে (৬৬১-৭৫০ খ্রি.) সেই ধারা অব্যাহত ছিল। অবশ্য এ সময়ে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের গতি ছিল প্রথম যুগের তুলনায় মন্থর। তবে বেশকিছু কারণে চিনারা শুরুতে মুসলিম শক্তিকে নিজেদের জন্য ততটা আগ্রাসী বলে ভাবছিল না। যেমন: মুসলমানদের বিজয়যাত্রা তখনো চিন থেকে বহু দূরে। তদুপরি মধ্য এশিয়ায় তাদের সবচে বড় শত্রু পারস্যের সাসানি রাজ্যের মরণকামড় থেকে বাঁচতে চিন নিজেও তখন মরিয়া হয়ে আছে। বড় কোনো বিপর্যয় এড়াতে জেনেবুঝেই যেন তারা সাসানিদের মূল রসদ জোগানো পারস্য সম্রাটের কথা ভুলে থাকতে চাচ্ছিল।

তবে মুসলমানদের সাথে তাদের মূল সংঘর্ষ বাধে তখন, যখন খিলাফতের সেনারা ইরানের ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়। নিজেদের বিজিত রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজনেই মধ্য এশিয়ার কর্তৃত্ব হাতে নেয়া তখন মুসলমানদের কর্তব্য হয়ে পড়ে। সেই দায়িত্বের বোধ থেকে তারা জয় করে নেয় বর্তমান আফগানের কাবুল, হেরাত ও গজনি। এতদাঞ্চলের বিজয়ের ইতিহাসে তৎকালীন খোরাসানের শাসকদের বীরত্বের প্রভাব ছিল প্রকট। বর্তমানে যাকে আমরা আফগানিস্তান বলে চিনি, বিধর্মীদের হাত থেকে এই ভূমি উদ্ধারের পেছনে সাহসী ভূমিকা ছিল খোরাসানের অধিপতি ইবনু আবি সুফরা রহিমাহুল্লাহর।

৮৫ হিজরি সালে (৭০৪ খ্রি.) একদা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তার সেনাদের জমা করে বলেন: 'কে আছো চিনের দিকে যাত্রা করতে আগ্রহী, আমি তাকে সেখানকার শাসক বানিয়ে দেব?' এরপর সে কুতাইবা ইবনু মুসলিম আল-বাহিলিকে এ কাজের উপযুক্ত ভেবে ৮৫ হিজরিতে খোরাসানের দায়িত্ব দিয়ে বেশকিছু বিজয়ের প্রতিজ্ঞা করে রওনা করিয়ে দেন। সাহসী এ সেনাপতির খোরাসানে আগমনের পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে সমরখন্দ, বুখারাসহ মধ্য এশিয়া, বিশেষ করে আফগানিস্তান ও উজবেকিস্তানের বিরাট অংশ মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে আরব ও চিন—প্রাচ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের দুই পরাশক্তির মধ্যে মোকাবেলা তখন সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

মুসলিম সেনাদল ঘাড়ে এসে নিশ্বাস নিলেও মোটাদাগে চিন তখনো নিজেদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যা ও অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে সামরিকভাবে তাদের

মোকাবেলার জন্য সক্ষম ছিল না। চৈনিক সমাজের সর্বত্র কেবল মুসলমানদের বিপক্ষে সেনা অভিযানের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা, নেতাদের একে অপরকে উৎসাহিত করার প্রবণতাই লক্ষ করা যাচ্ছিল; কিন্তু দরকারি কোনো পদক্ষেপই যেন তারা নিতে পারছিল না। তাছাড়া মুসলিম বাহিনীর ব্যাপারে তারা যা শুনে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে, তা তাদেরকে ভড়কে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। চিনের এই সীমান্তে এসে দাঁড়াবার আগে, তারা পারস্যের মতো বিশাল দুর্দমনীয় শক্তিকে নাস্তানাবুদ করে এসেছে। ধ্বংস করে দিয়েছে রোমানদের আধিপত্য, এমনকি ইউরোপের ফ্রান্স পর্যন্ত তাদের বিজয়বাহিনীর হাত থেকে নিস্তার পায়নি।

যুদ্ধের আগে যুদ্ধ

ট্যাং রাজবংশের সাথে উমাইয়া খিলাফতের প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে। কারণটা ছিল ফারগানা উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার। সে সময় তিব্বতীয় রাজবংশ উমাইয়াদের পক্ষাবলম্বন করেছিল। প্রাথমিকভাবে উমাইয়া ও তিব্বতীয়দের মিলিত শক্তির লক্ষ্য অর্জিত হলে অচিরেই ট্যাং সেনাবাহিনী তাদের হৃত স্বার্থ পুনরুদ্ধার করে ফেলতে সক্ষম হয়। এদিকে দুই বছর পর ৭১৭ সালে উমাইয়া ও তিব্বতীয়রা মিলিতভাবে শিনজিয়াং আক্রমণ করে এবং আকসু অঞ্চলের দুটি শহর অবরোধ করে রাখে। অবশ্য ট্যাং রাজবংশের অনুগত কারলুক তুর্কদের একটি বাহিনী সেই অবরোধ ভেঙে শহর দুটিকে পুনরায় ট্যাং রাজবংশের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এই কারলুকরাই পরবর্তী সময়ে তালাস নদীর যুদ্ধে, জয়ে-বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

পরের তিন দশক পরিস্থিতি অনেকটাই শান্ত ছিল। উমাইয়াদের সাথে তুর্কি রাজ্যগুলোর বেশ কিছু সংঘর্ষ হলেও এ সময় উমাইয়া খিলাফতের সীমানায় খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি। তবে এ সময়ে মধ্য এশিয়ায় ট্যাং রাজবংশের আধিপত্য ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। বলা হয়, ট্যাং রাজবংশ তাদের তিন শতাব্দী রাজত্বকালের ইতিহাসে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রতিপত্তির একদম চূড়ায় আরোহণ করেছিল। তবে ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাস এবং ইতিহাসের অমোঘ সত্য হলো, পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করতে দীর্ঘসময় লাগলেও পতনকাল কিন্তু খুবই সামান্য হয়ে থাকে; ট্যাং রাজবংশের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটেছিল।

উমাইয়াদের পতন ও শিয়ানশির সফল অভিযান

ক্ষমতা দখল ও রক্ষাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে উমাইয়া শাসনের অবস্থা তখন টালমাটাল। এদিকে মধ্য এশিয়ার বেশকিছু অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হলেও গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু ভূমি তখনো রয়ে গেছে চৈনিকদের দখলে। তাই উমাইয়াদের আন্তঃবিদ্রোহের এই দুর্বলতাকে গাও প্রাধান্য বিস্তারের মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এতদাঞ্চলে তাদের হস্তচ্যুত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য সেনা অভিযান শুরু করে দেয়।

হঠাৎ মুসলিম সাম্রাজ্যের এক আচানক পরিবর্তন সব হিসাব নিকাশ পাল্টে ফেলে। উমাইয়াদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের বিদ্রোহ সফলতার মুখ দেখে। প্রায় নব্বই বছর মুসলিম বিশ্বকে শাসন করার পর ৭৫১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়াদের খিলাফতের অবসান ঘটে আব্বাসীয়দের হাতে। উমাইয়াদের পতন চিনাদের আরও উগ্র করে তোলে। ৭৪৭ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ট্যাং সেনাবাহিনীর কোরীয় সেনাপতি গাও শিয়ানশি তৎকালীন তিব্বত রাজ্যের অন্তর্গত গিলগিট (বর্তমানে পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে) জয় করে ও মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু ছোট ছোট রাজ্যকে ট্যাং সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত করে। এরপর সোৎসাহে ছুটে চলে এতদাঞ্চলের মুসলিম অধিকৃত জনপদগুলো চৈনিকদের করতলগত করার লালসায়। বর্তমান উজবেকিস্তানের বেশকিছু ছোট-বড় রাজ্য দখলে নিয়ে তারা তখন মধ্য এশিয়ায় মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শহর কাবুলে হুমকি-ধমকি দিতে শুরু করে।

কিন্তু শুরুর দিকে আব্বাসীয় খিলাফতের বিজয়নেশা উমাইয়াদের চেয়েও তীক্ষ্ণ ছিল। আর এ কারণেই ক্ষমতায় বসেই আব্বাসিরা মধ্য এশিয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন। এ অঞ্চলে মুসলিমশাসিত রাজ্যগুলোর সীমান্ত রক্ষার তাগিদে ১৩৩ হিজরি সনে খলিফা আবুল আব্বাস সাফফাহ খোরাসানের শাসক আবু মুসলিম বরাবর একটি চিঠি লিখেন। বলেন, মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্তানে মুসলমানদের মর্যাদা অটুট রাখতে সেনা অভিযান পরিচালনা করা দরকার। আবু মুসলিম খলিফার নির্দেশে নিজের বাহিনী নিয়ে মার্ভ নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নেন। সেখানে তাখারিস্তান (বর্তমান আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) থেকে বড় অংকের সেনাসাহায্য আবু মুসলিমের বাহিনীতে এসে যোগ হয়। তিনি সকলকে নিয়ে এগিয়ে যান সমরকন্দের দিকে।

এবারও ফারগানা উপত্যকা ছিল আরব ও চিন, দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্বের অন্যতম

ক্ষেত্র। ছোট্ট রাজ্য ফারগানা ও তাসখন্দের[১] মধ্যকার দ্বন্দ্বই মূলত দুই পরাশক্তিকে যুদ্ধের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফারগানার আমিরের আমন্ত্রণে গাও শিয়ানশির সৈন্যরা তাসখন্দ দখল করে নিলে অনন্যোপায় তাসখন্দের আমির স্থানীয় আরবদের সাহায্য চেয়ে বসে। তাসখন্দের আমিরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুফার সাবেক গভর্নর মুসলিম সেনাপতি যিয়াদ ইবনে সালিহ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে সমরকন্দের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে খলিফা প্রেরিত খোরাসানের আমির আবু মুসলিমের বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং দুজনের সেনাদল এক বাহিনীতে পরিণত হয়।

এদিকে মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর জেনে চিনারা সেনা জমায়েত শুরু করে। যুদ্ধে কোন পক্ষে সৈন্য সংখ্যা কত ছিল, এ নিয়ে দু'দলের পরস্পরবিরোধী দাবি লক্ষ করা যায়। চিনাদের ভাষ্যমতে, আব্বাসি সেনাদল এবং তাদের মিত্রদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষাধিক। এদিকে ট্যাং ও তাদের মিত্রদের দ্বারা গঠিত গাও শিয়ানশির নেতৃত্বাধীন চৈনিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে আব্বাসীয়দের দাবি হলো, তারা ছিল এক লক্ষের কাছাকাছি। তবে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ এবং আধুনিক গবেষণা থেকে জানা যায়, উভয় পক্ষেরই সৈন্যসংখ্যা ছিল মোটামুটি ২৫-৩০ হাজারের মতো; অর্থাৎ দুই পক্ষের শক্তিমত্তা অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

যুদ্ধের কথা

অনিবার্য সংঘর্ষের আগে পূর্ব ও পশ্চিমের দুই পরাশক্তি এবং তাদের মিত্রদের নিয়ে গঠিত সেনাদল মিলিত হলো তালাস নদীর পাড়ে। তালাস নদী কিরগিজস্তান এবং কাজাখস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। 'তালাস নদীর যুদ্ধ' যে তালাস নদীর পাড়ে বা এর আশেপাশে সংঘটিত হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক স্থানটি ঠিক কোথায় অবস্থিত, তা আজও চিহ্নিত করা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়, খুব সম্ভবত জায়গাটি কিরগিজস্তান এবং কাজাখস্তান সীমান্তের কাছে কোথাও।

প্রথম পাঁচদিন উভয় পক্ষের লড়াই চলেছে সমানে সমানে। বলতে গেলে ট্যাং সেনাবাহিনীই কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে বলে বোধ হচ্ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে, খিলাফতের প্রাণকেন্দ্রগুলো থেকে মধ্য এশিয়ার বিশাল দূরত্ব এবং এসব অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ অনারব ও অমুসলিম হওয়ায় আব্বাসীয় বাহিনী

[১] উজবেকিস্তানের বর্তমান রাজধানীর নাম তাসখন্দ।

পশ্চিমদিকের ফ্রন্টগুলোতে যতটুকু শক্তিশালী ছিল, মধ্য এশিয়া ফ্রন্টে ততটা শক্তিশালী ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। এতদসত্ত্বেও কারলুক তুর্কদের[১] এক রহস্যজনক ভূমিকায় ষষ্ঠ দিনে যুদ্ধের ফলাফল আব্বাসীয়দের পক্ষে এসে যায়। পরাজয় ঘটে ট্যাং সেনাবাহিনীর। চৈনিক সূত্রগুলোর দাবি, কারলুক তুর্করা যুদ্ধের মাঝখানে আচমকা বিশ্বাসঘাতকতা করে আব্বাসীয়দের পক্ষাবলম্বন করায় তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। এদিকে আব্বাসীয়দের দাবি, কারলুক তুর্করা যুদ্ধের আগেই তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল এবং তারা দূর থেকে ময়দানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। পরে সুযোগ বুঝে তারা যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়।

কারলুকদের দ্বন্দ্বময় ভূমিকা: ইতিহাস কী বলে?

কারলুকদের ভূমিকা নিয়ে দুই পক্ষের এমন পরস্পরবিরোধী দাবি থেকে সত্যটা নিরূপণ করা বেশ কঠিন। তবে চৈনিকদের দাবি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কারলুক তুর্করা তাদের সাথেই আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করছিল। হঠাৎ করে এতগুলো সৈন্যের পক্ষ পরিবর্তন করার কাহিনি শুনতে বেশ অবিশ্বাস্য লাগে। তার চেয়ে বরং দুই পক্ষের দাবি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি—কারলুক তুর্করা প্রথম পাঁচদিন যুদ্ধ না করে দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিল। পূর্বের মিত্রতা থেকে ট্যাং সেনাবাহিনী মনে করেছিল, এবারও বুঝি কারলুকদের সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে কারলুক ও আব্বাসীয় বাহিনীর চুক্তি হয়ে গেছে, সেই কথা তারা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। তাই কারলুকদের এই আচমকা আক্রমণ ট্যাংদের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকটা বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল ছিল। এছাড়া এই তত্ত্ব মেনে নিলে আব্বাসীয়দের সাথে যে কারলুকরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল, সেটাও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

সে যা-ই হোক, যুদ্ধের একপর্যায়ে মুসলিম বাহিনী তাদের মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে চৈনিক সেনাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে। পূর্বেই মুসলিম সেনারা ময়দানের চারপাশে পরিখা খনন করে রেখেছিল; চৈনিক সেনারা অবরোধ থেকে পালানোর চেষ্টা করলে অনেকেই এসব পরিখায় পড়ে প্রাণ হারায়। সেনাপতি গাও শিয়ানশি

[১] মধ্য এশিয়ার আলতাই পর্বতমালার পশ্চিমে তারবাগাতাই পাহাড়ের পাদদেশে বাস করা এক যাযাবর তুর্কি উপজাতির নাম কারলুক। স্থানীয়দের কাছে এরা গেলোলু নামেও পরিচিত। উইঘুর গোষ্ঠীর সাথে এদের জাতিগত নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

পরাজয় অনুভব করতে পেরে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে এবং তালাস নদীর এ যুদ্ধে চিনাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। মুসলিম সেনাপতি যিয়াদ ইবনু সালিহ ২০ হাজারের মতো চৈনিক সেনা বন্দি করে বাগদাদে পাঠিয়ে দেয়, সেখানে দাস-বিক্রি-বাজারে তাদেরকে গোলাম হিসেবে বেচে দেয়া হয়।

তালাস নদীর এ-যুদ্ধে চৈনিকদের কেন পরাজয় হয়েছিল সেই বিশ্লেষণের চেয়ে এই পরাজয়ের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা কী ছিল— ঐতিহাসিকভাবে সেটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যুদ্ধের পর

এই যুদ্ধে আব্বাসীয়দের একতরফা বিজয় অর্জিত হলেও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে বলতে হয়, প্রাথমিকভাবে এই যুদ্ধ থেকে কোনো পক্ষই আসলে তেমন সুবিধা নিতে পারেনি। কারণ আব্বাসীয়রা এই বিজয়কে পুঁজি করে সামনের দিকে অর্থাৎ চিনের মূল ভূখণ্ডে অগ্রসর হতে পারত। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। সে-সব কারণের অন্যতম ছিল— দূরত্ব। এত লম্বা দূরত্বে যোগাযোগ রক্ষা করা যেকোনো সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এছাড়া প্রতিশোধের নেশায় মত্ত ট্যাং রাজবংশও পরবর্তীতে আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে শুরু হওয়া বিদ্রোহের ভয়াবহ দাবানলে উল্টো ট্যাং সাম্রাজ্যই অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। ট্যাং রাজবংশের মসনদ কাঁপিয়ে দেওয়া এই বিদ্রোহ ইতিহাসে লুশান বিদ্রোহ নামে পরিচিত। লুশান বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল প্রায় ৭ বছর। আব্বাসীয়রা তালাসের যুদ্ধ জয়ের পর থেকেই এতদাঞ্চলে ট্যাংদের গতিবিধি লক্ষ রাখছিল। বিদ্রোহে প্রায় ঢলে পড়া এই সময়ে সুযোগ বুঝে কৌশলে তারা ট্যাং রাজবংশের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। মুসলমানদের এই সাহায্যে দুই পরাশক্তির বৈরিতার অবসান হয় এবং এতদাঞ্চলের পুরোটায় ধীরে ধীরে ইসলামের রঙ ছড়িয়ে পড়ে। ট্যাংরা দলে দলে মুসলিম হতে শুরু করলে মধ্য এশিয়ায় দিকে দিকে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটতে থাকে। পরবর্তীতে এই ভূমিতে জন্ম নেয় ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্রের জগদ্বিখ্যাত ইমামগণ; বিশেষত হাদিসশাস্ত্রের প্রথমসারির কিতাব সহিহ বুখারি ও জামে আত-তিরমিযির সংকলক ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাইল বুখারি এবং ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরি।

যেভাবে দুনিয়া জেনে গেল কাগজের অজানা রহস্য

এদিকে তালাস নদীর যুদ্ধে বহু সংখ্যক চিনা সৈন্য যুদ্ধবন্দি ও নিহত হয়। বিশাল ট্যাং সেনাবাহিনীর সেনাপতি গাও শিয়ানশি অল্প কিছু সৈন্যসহ প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধবন্দি চিনাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন কাগজ তৈরির দক্ষ কারিগর এবং প্রকৌশলী। তাদের মাধ্যমেই কাগজের প্রযুক্তি আরবদের হস্তগত হয়। সেই খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাই লুন কাগজ আবিষ্কার করার পর দীর্ঘ আটশ বছর এই কৌশল কেবল চিনা, কোরীয় ও জাপানিদেরই জ্ঞানায়ত্ত ছিল।

কিন্তু তালাস নদীর যুদ্ধের পর কাগজ তৈরির প্রযুক্তি প্রথমবারের মতো পূর্ব এশিয়ার বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমরকন্দে স্থাপিত হয় কাগজের কল এবং ক্রমান্বয়ে বাগদাদসহ আব্বাসীয় খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে এই শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। ইউরোপের প্রথম কাগজকল স্থাপিত হয়েছিল স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায়, ১০৫৬ সালে। অবশ্যি সেটাও আরব বণিকদেরই প্রভাবে; কেননা সে সময়ে আইবেরীয় উপদ্বীপ অর্থাৎ স্পেন-পর্তুগালের বিশাল অংশ মুসলিম-আরবদের করতলগত ছিল।

তালাস নদীর যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রভাব

শুধু কাগজের প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্যে নয়, তালাস নদীর যুদ্ধ বহুমাত্রিক কারণে ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। প্রথমত, মধ্য এশিয়ার পরবর্তী চার শতাব্দীর ভূ-রাজনীতি বদলে দিয়েছিল এই একটি যুদ্ধ। সাথে সাথে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করেছিল এতদাঞ্চলের ধর্ম, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে। কারণ তালাস নদীর যুদ্ধ অনেকটা অলিখিতভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছিল মধ্যে এশিয়ার কতটুকু অংশ আব্বাসীয় খেলাফতের নিয়ন্ত্রণে থাকবে আর কতটুকু থাকবে ট্যাং রাজবংশের হাতে। অর্থাৎ সে সময়ের দুই পরাশক্তির স্থানগত সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল নদীপাড়ের এই যুদ্ধে।

তালাস নদীর যুদ্ধে বিজয়ের পর সিল্করুটের একটা বড় অংশ আব্বাসীয়দের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, যা তাদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত লাভজনক ছিল। এছাড়া মধ্য এশিয়ার তুর্কি গোত্রগুলো এ সময় মুসলিমদের সান্নিধ্যে আসে এবং পরবর্তী তিন শতাব্দীতে ক্রমান্বয়ে এদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করে। এদিকে

তালাস নদীর যুদ্ধের পর তিব্বত ও চিনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। এ কারণে পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে তিব্বত এবং চিনের বৌদ্ধ ধর্ম ভিন্ন দিকে বিবর্তিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে বৌদ্ধ ধর্মের চিনা সংস্করণ এবং তিব্বতীয় সংস্করণে মৌলিকভাবে এত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[১]

[১] বৌদ্ধ ধর্ম গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্ম বিশ্বাস। এই ধর্ম আপাত অর্থে জীবন দর্শন। অনুসারীদের সংখ্যায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধর্ম বলে মনে হয়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি প্রধান মতবাদে বিভক্ত। প্রধান অংশটি হচ্ছে হীনযান বা থেরবাদ । দ্বিতীয়টি মহাযান নামে পরিচিত। বজ্রযান বা তান্ত্রিক মতবাদটি মহাযানের একটি অংশ। শ্রীলংকা, ভারত, ভুটান, নেপাল, লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, চিন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ও কোরিয়াসহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে এই ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী রয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাস করেন চিনে। বাংলাদেশের উপজাতীদের বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত।

মূলত চিন ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য একটি ঐতিহাসিক বিবর্তন। পুরো বিষয়টি নানামাত্রিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় লম্বা আলোচনা ব্যতীত এই পার্থক্যসূচির সমাধা করা সম্ভব নয়। এখানে সে আলোচনা আনার সুযোগ নেই, তাই অল্পকথায় সেরে যাচ্ছি।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে। কথিত আছে, ৩৫ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগী অবস্থায় দীর্ঘদিন সাধনার পর এক আশ্চর্য বোধিজ্ঞান লাভ করেন এবং পরবর্তী ৪৫ বছর তিনি ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সেটা প্রচার করেন। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত বিশেষ কিছু অঞ্চলে এই মতবাদটি অধিক চর্চিত হয়ে একসময় এক স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে বুদ্ধের এই বৌদ্ধধর্ম মূলত তিব্বত, ভুটান, ভারতের সিকিম, লাদাখ উপত্যকায় নিজস্বতা লাভ করে।

চিন ও ভারত এই দুই দেশের বিশাল সীমান্ত জুড়ে আছে হিমালয় পর্বতমালা। তিব্বত থেকে নেমে এসেছে খরস্রোতা ইয়ালুজাংপো, ভারতে তার নাম ব্রহ্মপুত্র। খুব একটা নাব্য নয় পার্বত্য এই নদ। চিন ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক দু'হাজার বছরেরও বেশি পুরনো হলেও দু'দেশের মধ্যে যাতায়াতের পথ কিন্তু কোনো সময়ই সুগম ছিল না। তুষারাবৃত গিরিপর্বত, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, জনমানবহীন মরুভূমির মধ্য দিয়ে বিপদকে হাতে নিয়ে যাত্রীদল সিল্করুট ধরে যাতায়াত করতেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ বছরে জুয়ান জ্যাং নামক এক বৌদ্ধভিক্ষু এই পথেই ধর্মীয় বোধের পূর্ণতা লাভের জন্য তিব্বতে আসেন। এরপর চিনের তৎকালীন সম্রাট মিং, ভিক্ষু কুমারজিব এবং বৌদ্ধ সন্যাসী ফা-সিয়ান ধর্মীয় দীক্ষার জন্য এই বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে ভারতে আসেন। তাদের মাধ্যমেই চিনে বৌদ্ধধর্ম পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে অধিক চর্চা এবং জনসংখ্যার আধিক্যের দরুণ তিব্বতের চেয়ে চিনেই ধর্মটি ব্যাপকতা লাভ করে বেশি।

তবে বর্তমান চিনের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ যাচাই করলে দেখা যায়, শানধর্ম-থাওধর্মই বর্তমানে তাদের বৃহত্তম ধর্ম। চিনের ২০-৩০% লোক এই ধর্মগুলি পালন করেন। এদের মধ্যে প্রায় ১৬ কোটি লোক, অর্থাৎ চিনের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১% মাৎসু নামের দেবীর পূজা করে। বৌদ্ধধর্ম এখন চিনের ২য় বৃহত্তম ধর্ম (১৮-২০% লোক)। তাছাড়া দেশের ৩-৪% লোক খ্রিস্টান এবং ১-২% মুসলমান।

ইতিহাসে পাতায় তালাসের যুদ্ধ

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তৎকালীন মুসলিম ঐতিহাসিকদের কলমে ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধের তেমন কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এমনকি জগৎবিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং তাফসিরকারক ইবনু জারির তাবারি রহ. (৮৩৯-৯২৩) তাঁর ইতিহাসগ্রন্থ তারিখে তাবারিতে তালাস নদীর এ যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেননি। তবে এই যুদ্ধের প্রায় অর্ধ সহস্রাব্দ পর ইবনে আসির রহ. (১১৬০-১২৩৩) এবং ইমাম যাহাবি রহি. (১২৭৪-১৩৪৮)-এর কিতাবে এই যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যা-ই হোক, সে-সময়ের ভূ-রাজনীতির বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তালাস নদীর এ যুদ্ধ সময়ের পটবদলে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিল, যা কোনো অংশেই টুরসের যুদ্ধ কিংবা আইন জালুতের যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। কিন্তু বিস্ময়করভাবে, এই যুদ্ধটি সাধারণ মানুষ তো বটেই, ইতিহাসের অনেক উৎসুক পাঠকদের কাছেও বেশ অপরিচিত।

তবে মৌলিকভাবে চিন ও তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মে সময়ের পালাবদলে যে ব্যতিক্রমগুলো দেখা যায়, তা বেশ আলোচনাসাপেক্ষ। অল্পকথায় কিছু এখানে তুলে ধরছি:

- চৈনিকরা গৌতম বুদ্ধের জীবন, দর্শন এবং শিক্ষাকে পুরোপরি আঁকড়ে আছে এখনও; কিন্তু তিব্বতীয়রা অনেকাংশেই সেটা থেকে সরে এসেছে। অনেকে মনে করেন, এটা তাদের রাজ্যে প্রচলিত জৈন ধর্মের প্রভাবেই ঘটেছে।
- তিব্বতীয়দের বিশ্বাসমতে, সবকিছুতেই আত্মা আছে। এমনকি পাথরে, পানিতে, খাদ্যদ্রব্যসহ সকল বস্তুর ভেতরেই আত্মা প্রবিষ্ট আছে। তবে চিনারা এমনকিছু মনে করে না। তিব্বতীয়দের ভাষ্যমতে, চিনে নাস্তিক্য মতবাদের প্রভাবে ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও নাকি পরবির্তন এসে গেছে।
- চিনে প্রাণিহত্যা ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ হলেও অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য খাদ্য হিসেবে প্রাণিহত্যা বৈধ। পক্ষান্তরে তিব্বতীয়দের বিশ্বাসমতে, মরে গেলেও কোনো প্রাণীকে সামান্য আঘাত দেয়াও বৈধ নয়।
- হিন্দুধর্মের প্রভাবে তিব্বতীয় বৌদ্ধরা ভাবে, মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মা জীবিত ঘোরাফেরা করে। কিন্তু চিনের বৌদ্ধ এমন কোনো বিশ্বাসকে পাত্তা দেয় না। তাদের মতে, মৃত্যুর পর ব্যক্তির আর কিছুই বাকি থাকে না। সব মাটির সাথে মিশে যায়।

সুত্র :

http://www.chinatoday.com.cn/ctenglish/se/txt/2009-06/19/content_203310.htm

Bell, Charles: Tibet Past & Present. Reprint, New Delhi, 1990 (originally published in Oxford, 1924)

আইন জালুতের যুদ্ধ
Battle of Ain Jalut

তারিখ:	৬৫৮ হিজরি / ১২৬০ খ্রি.
স্থান:	আইন জালুত, নাবলুস, ফিলিস্তিন
ফলাফল:	মুসলিম বাহিনীর বিজয়

পক্ষ-বিপক্ষ:	মামলুক সাম্রাজ্য	মোঙ্গল সাম্রাজ্য
সেনাপ্রধান:	সাইফুদ্দিন কুতুয	কিতবুগা নয়ান নাসতুরি
সেনাসংখ্যা:	২০ হাজার	২০ হাজার
ক্ষয়ক্ষতি:	সামান্য	পুরো বাহিনী ধ্বংস

৬৫৮

হিজরির রমাদান মাসে সংঘটিত আইন জালুত যুদ্ধকে ইসলামি ইতিহাসে অন্যতম নজিরবিহীন ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের পায়ের কাছে আনত হয়ে এসেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে ভয়ংকর হিংস্র জাতি হিসেবে পরিচিত মোঙ্গলরা। সে-সময় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যের মালিক ছিল এরা। চেঙ্গিসখানের সময় থেকে শুরু হওয়া মোঙ্গলদের জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল পরবর্তী গ্রেট খানদের সময়ও। বাগদাদ, সমরখন্দ, বেইজিং, বুখারা, আলেপ্পোর মত বড় বড় শহর তাতারিদের হামলায় মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। কি পূর্ব কি পশ্চিম, এমন একটিও রাজ্য ছিল না, যারা মোঙ্গলদের গতিপথে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বিশ্বজয়ের যে আকাঙ্খা অপূর্ণ রেখে মারা গিয়েছিলেন চেঙ্গিস খান, তার পুত্র ও পৌত্ররা সেটাকেই যেন সত্যে পরিণত করতে যাচ্ছিল। তাদের বর্বরতায় ইউরোপ ও এশিয়ার কোটি কোটি নিরীহ মানুষ প্রাণ দিয়েছে অনেকটা বিনা-প্রতিরোধে। তাই সারা দুনিয়ার মানুষ ভেবেই নিয়েছিল, মোঙ্গলদের থামানো বোধ হয় পৃথিবীবাসীর জন্য অসম্ভব। কিন্তু ১২৬০ সালে হঠাৎই থেমে যায় অপ্রতিরোধ্য মোঙ্গলদের জয়রথ। এক অসাধ্য সাধন হয়ে যায় ফিলিস্তিনের গাজার অদূরে, নাবলুস শহরের পাশে আইন জালুত প্রান্তরে। রক্তক্ষয়ী এক শক্ত মোকাবেলায় মুসলিম বাহিনীর সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে বিশ্ব-পরাশক্তি হালাকু খানের বাহিনী। এ পরাজয় শামে তাদের ধ্বংসাত্মক অনুপ্রবেশ বাধাগ্রস্ত করে এবং ৬৫৬ হিজরিতে (১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে) খেলাফতের রাজধানী বাগদাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া তাতারদের অগ্রযাত্রা একেবারে রুদ্ধ করে দেয়। পাশাপাশি এই হিংস্র জাতি দমনের মধ্য দিয়ে উসমানি খেলাফত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় দুইশো বছরের জন্য, তৎসময়ের প্রধান মুসলিম শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মামলুক সাম্রাজ্য।

চেঙ্গিস খান এবং মোঙ্গল জাতির উত্থান

ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা রাখেন, অথচ চেঙ্গিস খানের নাম শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দায়। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম অপরাজিত জেনারেল সে। তার সমকক্ষ সেনাপতির সংখ্যা মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন, যে এককভাবে জয় করেছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অঞ্চল এবং যে কি-না একই সাথে ৪ কোটি নিরাপরাধ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ধ্বংস, হত্যা, চাতুর্য, ক্ষমতা, লিপ্সা এবং রণকুশলতার এক অভূতপূর্ব মিশেলে গড়া চেঙ্গিস খানের জীবনকাহিনি যেন একটি জীবন্ত সিনেমার মতো। তার ঘটনাবহুল জীবনের রোমাঞ্চকর উত্থান-পতন এবং অচিন্তনীয় ধ্বংসলীলা সম্পর্কে না জানলে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়তো আমাদের অজানাই থেকে যাবে। তাই আইন জালুতের মূল অধ্যায় শুরু করার আগে মোঙ্গল জাতি ও তার জনকের ব্যাপারে সামান্য আলোকপাত করা জরুরি মনে করছি।

মঙ্গোলিয়ার স্তেপ বা তৃণ-চারণভূমিতে জন্ম হয়েছিল ইতিহাস সৃষ্টিকারী দাপুটে এই বিজেতার। ধারণা করা হয়, চেঙ্গিসের জন্মস্থান ছিল উত্তর মঙ্গোলিয়ার খেনতি পর্বতমালার অন্তর্ভুক্ত বুরখান পর্বতের খুব কাছে দেলুন বলদাখ নামের এক জায়গায়। তার জন্ম খুব সম্ভবত ১১৬২ সালে। ওনন নদীর পাড়ে তৃণচারণ ভূমিতেই কেটেছে এই খুনপিয়াসী নেতার শৈশব।

যদিও সারা পৃথিবীর কাছে তিনি পরিচিত চেঙ্গিস খান নামে, তবে তার আসল নাম ‘তেমুজিন’। অনেক যুদ্ধ এবং রক্তপাতের পর ১২০৬ সালে তেমুজিন যখন সমগ্র মঙ্গোলিয়ান স্তেপের একক অধিপতি হিসাবে আবির্ভূত হন, তখন তাকে ‘চেঙ্গিস খান’ উপাধি দেওয়া হয়; যার বাংলা অর্থ ‘সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি’ বা এ-জাতীয় কিছু। হয়তো নামের এমন অর্থের কারণেই তার পিতৃদত্ত নাম তেমুজিন কালের অতলে হারিয়ে গেছে চেঙ্গিস নামের পরাক্রমের কাছে।

তেমুজিনের চেঙ্গিস হয়ে ওঠার গল্প

চেঙ্গিস খানের ছেলেবেলা ছিল খুবই ঘটনাবহুল। তার পিতা ছিলেন স্থানীয় গোত্রপতি। তাই আভিজাত্য ছিল চেঙ্গিস খানের জন্মগত। মঙ্গোল রীতি অনুসারে বারো বছর বয়সে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হয় তাকে বোর্তে নামের এক ফুটফুটে মেয়েকে। তবে ছোট্ট তেমুজিনের কপালে সুখ বেশি দিন সইল না। সে সময়ের ইউরেশিয়ান স্তেপ

অঞ্চলে এখনকার দিনের আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের মত একক কোনো জাতি বসবাস করত না। বরং লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত এই তৃণচারণ ভূমি বিভক্ত ছিল বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে, দলে ও উপদলে। ছিল না তাদের কোনো সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় আইন কানুন। গোত্র বা কবিলাতান্ত্রিক সমাজে গোত্রের রীতিনীতিই ছিল চূড়ান্ত কথা। চেঙ্গিসের জন্মের সময় স্তেপ ভূমিতে ছিল তাতারদের বড্ড আধিপত্য। তার পিতা ছিলেন তাতারদের ঘোর শত্রু। মোঙ্গল জনশ্রুতি অনুসারে, তাতারদের দেওয়া বিষমিশ্রিত ঘোড়ার দুধ পানেই মৃত্য হয়েছিল চেঙ্গিসের পিতার।

পিতার মৃত্যুর পর অপ্রাপ্ত বয়স্ক তেমুজিনের নেতৃত্ব মেনে নিতে চাইল না তার গোত্রের লোকজন। তাই একে একে গোত্রের সব মানুষ তার পরিবারকে রেখে চলে যেতে শুরু করল বিভিন্ন জায়গায়। এই সময়টা ছিল চেঙ্গিস খানের জীবনের সবেচেয়ে কঠিন সময়। বালক চেঙ্গিস পরবর্তী জীবনের বিপদসঙ্কুল পথ চলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক এই সময়টা থেকেই। শৈশবের প্রতিকূলতা তাকে তিলে তিলে মজবুত করে গড়ে তুলছিল অনাগত ভবিষ্যতের জন্য। বিভিন্ন ঘটনার কারণে চেঙ্গিসের চরিত্রের কঠোরতা সেই বাল্যকাল থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। মাত্র তেরো বছর বয়সে নিজের সৎ ভাইকে হত্যা করেছিল নিখুঁত তিরন্দাজ বালক তেমুজিন। হত্যার কারণ খুব সামান্য। খাবারের ভাগাভাগি নিয়ে দুই ভাইয়ের ঝগড়া।

১৭ বছর বয়সে তেমুজিন ঘরে তুলে আনে তার বাল্যবধূ বোর্তেকে। বহুগামী চেঙ্গিসের জীবনের হাজার হাজার নারীর সঙ্গ এলেও বোর্তে ছিল তার প্রথম এবং শেষ ভালবাসা। অসংখ্য সন্তানের পিতা হওয়া সত্ত্বেও শুধু বোর্তের গর্ভে জন্ম নেওয়া চার ছেলেকেই উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেছিল চেঙ্গিস। বোর্তে আর তেমুজিনের এই ভালবাসা ইতিহাসে বেঁচে আছে অনন্য হয়ে। বেঁচে আছে বোর্তের গর্ভে জন্ম নেওয়া চেঙ্গিসের চার ছেলের নাম জোচি, তুলুই, ওগেদাই এবং চুঘতাই খানের মাধ্যমে।

সে যাই হোক। বোর্তেকে নিয়ে খুব বেশি দিন একসাথে থাকা হল না তেমুজিনের। প্রতিপক্ষ অতর্কিত হামলা চালিয়ে তার গোত্রের সকলকে হত্যা করল এবং বোর্তেকে তুলে নিয়ে গেল অজানায়। এই ঘোর বিপদে তেমুজিন পিতৃবন্ধু তুঘরুল খান[১] এবং আপন ভাই জমুখার সাহায্যের শরণাপন্ন হল। তাদের সহযোগিতায়

[১] তুঘরুল খান ছিলেন এক শক্তিশালী গোত্রপ্রধান এবং চেঙ্গিসের পিতার রক্তের ভাই। সেকালে মোঙ্গলরা ছোটবেলায় ব্লাড ব্রাদার বা রক্তের ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ হতেন হাত কেটে রক্ত বিনিময় করে। ব্লাড ব্রাদাররা আজীবন একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন।

উদ্ধার করা হলো বোর্তেকে। শক্তিশালী দুই ব্যক্তির এই মহানুভবতাই তেমুজিনের মনে নেতা হবার লোভ জাগিয়ে তোলে। ধীরে ধীরে তাদের মাধ্যমে সে নিজেকে শক্ত এবং পাকাপোক্ত করে তোলে।

তবে উচ্চাভিলাষী তেমুজিন প্রস্তুত হচ্ছিল আরও বড় কোনো সাম্রাজ্যের মালিক হওয়ার জন্য। একসময় তেমুজিনের বেশকিছু স্বভাব ও নীতি তৎকালীন মোঙ্গল সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ হওয়ায় জমুখার সাথে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। তাছাড়া তারা দুজনই ছিল প্রচণ্ড ক্ষমতালোভী; দুজনেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল নিজের একাধিকপত্য কায়েম করা। তাই কালের আবর্তে দুজনের সংঘাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই সূত্র ধরে তাদের গোত্র দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তেমুজিনের অংশের সাথে জমুখার বেশকিছু যুদ্ধও সংঘটিত হয়। দুঃখজনকভাবে সবগুলোতেই জমুখা পরাজিত হয়। ফলে তার গোত্রের লোকেরাই তাকে চেঙ্গিসের হাতে তুলে দিয়ে যায়।

চেঙ্গিস খানের কাছে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধ ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। জমুখার যে জেনারেলরা চেঙ্গিসের কাছে পুরস্কৃত হওয়ার আশায় নিজেদের নেতাকে তুলে দিয়েছিল শত্রুর হাতে, তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি হয়েছিল খুবই ভয়ঙ্কর। চেঙ্গিস তাদের সবাইকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিল। জমুখাকে তার নিজের ইচ্ছা অনুসারেই মোঙ্গল রীতি অনুপাতে পিঠ ভেঙে হত্যা করা হয়েছিল। যদিও চেঙ্গিস জমুখাকে হত্যা করতে চায়নি বলে বেশ কিছু সূত্রে উঠে এসেছে; কিন্তু জমুখা নিজেই পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়নি। জমুখাকে পরাজিত করার পর মঙ্গোলিয়ার বাকি গোত্রগুলোও একে একে চেঙ্গিসের বশ্যতা মেনে নিতে থাকে এবং সে বছরই তাকে 'চেঙ্গিস খান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

চেঙ্গিসের অজেয় বাহিনী

চেঙ্গিস খান হওয়ার পর তেমুজিন আরও ২১ বছর বেঁচে ছিলেন, আর সেটাই ছিল তার জীবনের স্বর্ণযুগ। সেই সময়ের মধ্যে তিনি জয় করেছিলেন চিন, ইউরোপ এবং এশিয়ার প্রায় ১ কোটি বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল। ১২১১ সালে পশ্চিম জিন (Jin) সাম্রাজ্য, ১২১৫ সালের ঐশ্বর্যমণ্ডিত জিয়া (xia) সাম্রাজ্য, ১২২০ সালে প্রবল প্রতাপশালী খোয়ারেজেম সাম্রাজ্য তার পদানত হয়। এছাড়া আফগানিস্তান হয়ে ভারতের পাঞ্জাব পর্যন্ত চলে এসেছিল চেঙ্গিসের বাহিনী। ককেশাস ও

কৃষ্ণসাগরের আশেপাশের অঞ্চলগুলোও একে একে অন্তর্ভুক্ত থাকে চেঙ্গিসের সাম্রাজ্যে। ইউরোপে চেঙ্গিসের জয়রথ পৌঁছেছিল বুলগেরিয়া হয়ে ইউক্রেন পর্যন্ত। অবাক করা ব্যাপার, চিরকাল অজেয় রাশিয়া জয় করতে চেঙ্গিস খানের বাহিনীর একটুও বেগ পেতে হয়নি।

বর্বরতার বর্বর চিত্র

চেঙ্গিস খানের রাজ্য জয় করার পদ্ধতি ছিল ভয়াবহ রকমের বীভৎস। কোনো শহর জয়ের আগে সে শহরের মানুষদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আদেশ করা হতো। সেটা না মেনে নিলে শুরু হত অবরোধ, তারপর একসময় অনাহারক্লিষ্ট নগরবাসীর উপর চালানো হত অতর্কিত হামলা। নারী, পুরুষ, শিশু কেউই মোঙ্গল বাহিনীর বর্বরতা থেকে বাঁচতে পারেনি। মারভ, বেইজিং, সমরখন্দের মত মধ্যযুগের জনবহুল শহরগুলো মোঙ্গল বাহিনীর পাশবিকতায় একদম মাটির সাথে মিশে গিয়েছিল। বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের উরগেঞ্জ ছিল মধ্যযুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর একটি। সেটিও মোঙ্গল বাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে। প্রায় ১২ লক্ষ মানুষের এই শহর জয় করার সময় চেঙ্গিসের বাহিনীর ৫০ হাজার সৈনিকের প্রত্যককে গড়ে ২৪ জন করে নিরীহ মানুষ হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

মোঙ্গল বাহিনী যেসব এলাকায় হামলা চালাত, সেগুলো হয়ে পড়ত জনশূন্য। হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত সভ্যতা পরিণত হত রূপকথার কোনো ভূতুড়ে নগরীতে। আজও সেন্ট্রাল এশিয়ার বেশ কিছু শহরের ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে মোঙ্গল আক্রমণের ভয়াবহতার সাক্ষী হিসাবে। ধারণা করা হয়, চেঙ্গিস খানের বিভিন্ন অভিযানে মারা পড়েছিল প্রায় ৪ কোটির মতো সাধারণ মানুষ, যা তৎকালীন পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ।[১]

[১] এতগুলো মানুষের নির্মম মৃত্যুর দায় নিয়ে অবশেষে ১২২৭ সালে মৃত্যু হয় পৃথিবীর বুকে মানবতার সবচে বড় শত্রুদের কাতারে জায়গা করে নেয়া এই দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্য বিজেতার। তবে চেঙ্গিসের সমাধি কোথায় সেটা কেউই জানেনা। কারণ, তার শেষকৃত্যে উপস্থিত সবাইকে হত্যা করে ফেলা হয়। আর চেঙ্গিসের উত্তরাধিকারীরাও পরবর্তী সময়ে সেটা গোপন রেখে দেয়। ফলে আজও পর্যন্ত চেঙ্গিসের সমাধি পৃথিবীবাসীর জন্য এক অজানা রহস্য হয়ে আছে।

মুসলিম শহরগুলোতে মোঙ্গলদের ধ্বংসতাণ্ডব

মোঙ্গলদের উপদ্রবের যুগে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো বেশ কয়েকটি ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, যেটি ইসলামের উত্থানের শুরু থেকে তখন পর্যন্ত ৬০০ বছরের ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি। ইসলামি খিলাফত তখন আব্বাসীয়দের হাতে। নামমাত্র আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী ছিল বাগদাদে। খলিফা হারুন উর রশিদ, খলিফা মুতাসিম বিল্লাহ কিংবা খলিফা মামুন, মনসুর ও মুন্তাসিরদের পরাক্রম তখন কেবলই কিংবদন্তি। বাস্তবের আব্বাসীয় শাসকরা আধ্যাত্মিক কিংবা সামরিক, কোনো ক্ষেত্রেই পূর্বসূরিদের কাছেপিঠে ছিলেন না। বরং খিলাফতের কর্ণধাররা ততদিনে পারস্পরিক অন্তরকোন্দল এবং ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে গেছে। এদিকে মোঙ্গলদের গ্রেট খান হিসেবে তখন আসনে ছিল মঙ্গে খান। তারই ভাই হালাকু তখন মধ্যপ্রাচ্যে মোঙ্গল বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হালাকু খান ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সুনজরে দেখতেন না মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে। তার উপর মুসলিম শহরগুলোর সঞ্চিত রাশি রাশি ধনভাণ্ডার হালাকু খানকে ভেতর থেকে প্ররোচিত করেছিল মুসলমানদের আবাসভূমিগুলো বিরান করে দিতে।

মুসলিম রাজ্য হিসেবে মোঙ্গলদের প্রথম ভয়াবহতার শিকার হয় পারস্য ও মা-ওয়ারাউন-নাহারের[১] খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের শহরগুলো। স্বভাবসুলভ হিংস্রতায় তারা সেখানকার বসতভিটা জ্বালিয়ে দেয় এবং নির্মমভাবে লোকদের হত্যা করে। একইভাবে তাদের নির্মমতার নজরে পড়ে আব্বাসি খেলাফত। তাদেরকেও বরণ করে নিতে হয় খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের ভয়াবহ পরিণতি।

ইসলামি স্বর্ণযুগের প্রাণকেন্দ্র, জ্ঞান ও বিজ্ঞান নগরী, খলিফা হারুন উর রশিদের শহর বাগদাদকে হাজারও অভিধায় অভিহিত করলেও এর পরিচয় শেষ হবে না। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচশ বছর বাগদাদ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগর। এই অর্ধ সহস্রাব্দে সম্পদ, প্রাচুর্য কিংবা জ্ঞান-গরিমায় বাগদাদের সমকক্ষ আর একটি শহরও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ১২৫৮ সালের দিকে স্বপ্নের এই শহরে আচমকা নেমে আসে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন—মোঙ্গল। হালাকু খানের সেই মরুঝড়ে হঠাৎ করেই ধ্বংস হয়ে যায় প্রায় ১০ লক্ষ লোকের

[১] দরিয়ায়ে সাইহুন (সাইর নদী) ও দরিয়ায়ে যাইহুন (আমু দরিয়া)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বলা হয় মা-ওয়ারাউন নাহার। এর শাব্দিক অর্থ নদীর ওপার। এই অঞ্চলের আধুনিক নাম ট্রান্স অক্সিয়ানা। ফারগানা, আশিজান, শাশ, সমরকন্দ, বুখারা, ফারাব, তিরমিয, নাসাফ, কাশগর ইত্যাদি শহর এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

আবাসভূমি তৎকালীন মেগাসিটি বাগদাদ। কী ঘটেছিল বাগদাদবাসীর ভাগ্যে? আসুন, ইতিহাসে ফিরে দেখি।

মোঙ্গলদের হাতে ধ্বংস হওয়া মুসলিম শহরগুলোর অন্যতম প্রধান শহর ছিল বাগদাদ। আইন জালুতের যুদ্ধের সূচনায় মোঙ্গলদের বর্বরতার এই অধ্যায়ে সুদীর্ঘকালের ইতিহাসবিজড়িত বাগদাদের নির্মম পরিণতি তুলনামূলক খানিকটা খুলে বলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।

বাগদাদ ধ্বংসের পটভূমি

চেঙ্গিস খানের নাতি হালাকু খান তখন মধ্যপ্রাচ্যে মোঙ্গলদের নেতা। সেখানে তার শাসনাধীন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সাথেই ছিল আব্বাসি খিলাফতের সীমানা। পূর্বসূরিদের ঐতিহ্য হারিয়ে জৌলুসহীন আব্বাসীয় খিলাফত তখন নখদন্তবিহীন খলিফা মুস্তাসিম বিল্লাহর হাতে। খিলাফতের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও খলিফার দুর্বলতার এই সময়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই ধুরন্ধর হালাকুর লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হল সম্পদশালী বাগদাদের দিকে। তবে সবকিছুর পরও বাগদাদের প্রতি হালাকুর এতটা তীব্র আক্রোশের মূল কারণ ছিল তার ধর্মীয় বিশ্বাস। বাগদাদ ম্যাসাকারের সময় বেছে বেছে মুসলমানদের হত্যা করার ঘটনা আমাদের এই দাবিকে আরও জোরালো করে; যদিও এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, নিষ্ঠুর মোঙ্গলবাহিনীর বিভিন্ন হত্যাযজ্ঞ থেকে কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীই আসলে রক্ষা পায়নি। তবে হালাকুর বিষয়টি অন্যদের চেয়ে একটু ভিন্ন। কারণ যুগটা ছিল ক্রুসেডের যুগ। হালাকুর মা এবং তার একজন প্রভাবশালী স্ত্রী ছিল খ্রিস্টান; যদিও হালাকু নিজে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিল বলে অনেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা, সেই সময়ে মুসলিমবিশ্বের কেন্দ্র বাগদাদকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়ার অর্থ ছিল, রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে পুরোপুরি পঙ্গু করে ফেলা।

হালাকুর বাগদাদ আক্রমণের গুঞ্জন ছুটল বাগদাদে। কাপুরুষ মুস্তাসিম বিল্লাহর কানে খবর যেতেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি তার সভাসদদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। সেই সময় মুস্তাসিমের প্রধান উজির ছিল ইবনুল আলকেমি। সে পরামর্শ দিল, সেনাবাহিনীর সংখ্যা কমিয়ে ফেলার। কারণ হিসাবে সে দেখাল, যেহেতু যুদ্ধ করে হালাকুকে পরাজিত করা অসম্ভব, তাই অযথা এত বড় বাহিনী পুষে হালাকুর কুদৃষ্টিতে পড়ার কোনো মানেই হয়না। তারচেয়ে বরং খলিফার উচিত হবে, সৈন্য

সংখ্যা কমিয়ে হালাকুর আস্থা অর্জন করা এবং যে-কোনো মূল্যে তার সাথে সন্ধির চেষ্টা করা। ভয়ানক ব্যাপার হলো, এই আলকেমি মূলত ছিল মোঙ্গলদের গুপ্তচর। তৎকালীন মোঙ্গলদের কূটনীতির একটি জঘন্য দিক ছিল, কোনো সাম্রাজ্য আক্রমণ করার আগে সেই সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষকে ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে হাত করে ফেলা। বাগদাদেও তারা সেটাই করেছিল ইবনুল আলকেমিকে দিয়ে। খলিফা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর আলকেমির কুমন্ত্রণায় নির্বোধ মুস্তাসিম বোকার মতো সেই চপলবুদ্ধির কাজটি করে বসলেন।

বাগদাদে ধ্বংসযজ্ঞ

নগরবাসী কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ একদিন সাইমুম ঝড়ের মতো উড়ে এসে বাগদাদকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল হালাকুর সৈন্যরা। আরোপ করার হল দুর্দমনীয় আবরোধ। 'হয় আত্মসমর্পণ, নয়তো না খেয়ে মৃত্যু' এমন পরিস্থিতিতে সৈন্যসামন্তবিহীন মুস্তাসিম নগরের বাইরে গেলেন হালাকুর সাথে দেখা করতে। ঢাল তলোয়ারবিহীন মুস্তাসিমের সাথে কোনো সন্ধি করতেই রাজি হল না কুটিল হালাকু খান; বরং সে তাকে নির্দেশ দিল, অবিলম্বে নগরফটক খুলে দিতে। নির্বোধ খলিফা ফটক খুলে দেওয়ার পর বানের জলের মতো বাগদাদের ভেতর প্রবেশ করতে লাগল হালাকুর সৈন্যরা।

শুরু হল নির্বিচার হত্যাযজ্ঞ। সেই হত্যাযজ্ঞের নারকীয়তা বোধ হয় কারও পক্ষেই লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঘরে, বাইরে, মসজিদে—যেখানে যাকে পাওয়া গেল— নারী, শিশু, বৃদ্ধ—নির্বিশেষে সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করল মোঙ্গলরা। শুধু মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা, ধ্বংস করে ফেলল বাগদাদের বিখ্যাত ইলম-সাধনালয় দারুল হিকমাহও; যেখানে সঞ্চিত ছিল বিগত ৫০০ বছরে মানব-ইতিহাসের অর্জিত প্রায় সকল জ্ঞান। ধারণা করা হয়, বাগদাদের দারুল হিকমাহ লাইব্রেরিতে পায় ১০ লক্ষ বই সংগৃহীত ছিল। সবগুলো বইই নির্দয়ভাবে দজলা নদীতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল জালিম হালাকু বাহিনী। সেই অমূল্য বইগুলো টিকে থাকলে মানব সভ্যতা এগিয়ে যাওয়ার জন্য হয়তো পরবর্তী আরও ৪০০ বছর অপেক্ষা করতে হত না।

একসময় লাশের বোটকা গন্ধে ভারী হয়ে এল বাগদাদের বাতাস। সেই বিশ্রী গন্ধে টিকতে না পেরে শহরের বাইরে চলে গেল হালাকু খান। তারপরও একাধারে ৪০

দিন চলল হত্যাযজ্ঞ। প্রায় পুরো জনসংখ্যা নির্মুল করে তবেই হালাকু খান তার অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করল। ততদিনে আরব্য রজনীর স্বপ্নের বাগদাদ পরিণত হয়ে গেছে দুঃস্বপ্নের কোনো ভূতুড়ে নগরীতে।

বাতাসে লাখো মানুষের ছাই

ধারণা করা হয়, বাগদাদে প্রায় ২ থেকে ১০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। পরিস্থিতির নারকীয়তা এতই ভয়াবহ ছিল যে, সেই ইতিহাস যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার মতো কোনো মানুষ সেখানে জীবিত ছিল না। বিপুল পরিমাণ মানুষের রক্ত ও বইয়ের কালির দরুন কিছুদিনের জন্য বদলে গিয়েছিল দজলা ও ফোরাতে পানির রঙ।

বাগদাদের পতনকে শুধু ইসলাম কিংবা মুসলিম বিশ্বের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস বলে বেঁধে রাখা মোটেও সমীচীন হবে না। বাগদাদে বিজ্ঞান ও দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিস্তারিত গবেষণা হতো, যেগুলো ছাড়িয়ে গিয়েছিল কোনো ধর্মীয় সীমারেখা। তাই বাগদাদ ধ্বংসের এই ঘটনা, গোটা মানবসভ্যতার জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। যে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে মানব সভ্যতাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল অটোম্যানদের উত্থান এবং ইউরোপের রেনেসাঁ পর্যন্ত।

বাগদাদের ধ্বংস কি শুধুই একটি নগরের পতন? নাকি আরও বেশি কিছু? অথচ বাগদাদ ধ্বংসের ঠিক ৪০ বছর আগে যখন চেঙ্গিস খান আব্বাসীয়দের প্রতিবেশী খোয়ারেজেম সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল, ইতিহাস ঘাঁটলে বলতে হয়, তাতে আব্বাসীয়দের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। কেননা তারা মনে করত, খোয়ারেজেম সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা তাদের আঞ্চলিক আধিপত্যের জন্য হুমকি। অথচ তারা একটিবারও ভাবেনি, এমন পরিণতি হতে পারে খোদ আমাদেরও। বরং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খোয়ারেজেমে সংঘটিত গণহত্যার চেয়েও ভয়ংকর ছিল বাগদাদের গণহত্যা। যেকোনো সভ্যতাই একসময় ধ্বংস হয়ে যায়; তবে সেই ধ্বংসের ইতিহাস থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। অনাগত প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সেই শিক্ষা। ধ্বংসের সময় বাগদাদে জ্ঞানীর অভাব ছিল না, মানুষের অভাব ছিল না, এমনকি অভাব ছিলনা সম্পদেরও। এত কিছু সত্ত্বেও কেন বাগদাদ এড়াতে পারল না তার করুণ পরিণতি? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে অনেক কিছু।

পিপাসা মেটে না জালিমের

৬৫৬ হিজরিতে বাগদাদকে ধুলোয় মিশিয়েও ক্ষান্ত হয়নি হালাকু খান। জর্জীয় এবং আর্মেনীয় মিত্রদের নিয়ে প্রায় এক লাখ বিশ হাজার সেনা নিয়ে সে এগিয়ে চলে দিয়ারে বকরের সিলভান শহরের দিকে। শহরের শাসক আল-কামিল মুহাম্মদ আইয়ুবির নেতৃত্বে সিলভানের সেনারা প্রায় দুই বছর পর্যন্ত মোঙ্গলদের শক্ত অবরোধ মোকাবেলা করে। কিন্তু এর মধ্যে তার শহরের খাবার শেষ হয়ে যায়, ক্ষুধার তাড়নায় মারা পড়ে অধিকাংশ অধিবাসী। একসময় উপায় না পেয়ে হার মেনে নেয় তারা। বাহিরের কোনো সাহায্য না পেয়ে নিজেদের জন্য ডেকে আনে মৃত্যুর পরোয়ানা। শহর খুলে দিতেই হালাকু খান তার চিরাচরিত নিয়মে নির্মমতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করে। এতটা নির্দয়ভাবে হত্যা করে শহরবাসীকে, যা ভাবতে গেলেও গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। শহরপতি আল-কামিল মুহাম্মদকে ধরে আনা হয় হালাকু খানের সামনে। সে তার শরীরের চামড়া কেটে তার হাতে তুলে দেয়। বলে, 'মৃত্যু পর্যন্ত এটা খেতে থাকবি।' আহত শরীরে শহরপতি হালাকুর নির্দেশ মানতে অপারগ হলে রাগে তরবারির এক কোপে হালাকু তার গর্দান ফেলে দেয়। এরপর অন্তরপ্রশান্তির জন্য শহরপতি আল-কামিলের কর্তিত মস্তক তরবারির আগায় তুলে ঘোরাতে থাকে।

ধ্বংসের এই ফেরিকারক এরপর হেঁটে যায় ঐতিহ্যের শহর আলেপ্পোর দিকে। টানা সাতদিন সেখানে পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়ে ৬৫৮ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে সে দামেশকে প্রবেশ করে। এ সময় হঠাৎ কারাকোরামে মোঙ্গল সম্রাট মঙ্গো খানের মৃত্যুর সংবাদ আসে তার কাছে। পত্রে বলা হয়, সাম্রাজ্যের নতুন খান নির্বাচনের তাগিদে কুরিলতাইয়ে মোঙ্গলদের পরামর্শসভায় চেঙ্গিস খানের সকল উত্তরাধিকারদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। হালাকু যেহেতু মঙ্গোর ভাই এবং কুরসির অন্যতম একজন দাবিদার, তাই সে অনতিবিলম্বে তার বাহিনী নিয়ে কুরিলতাইয়ের দিকে যাত্রা করে। যাবার সময় শামে তার অন্যতম সেনাপতি কিতবুগা নয়ান নাসতুরির নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্যের একটি সেনাদল ছেড়ে যায়।

৬৫৮ হিজরির ১৫ই রবিউল আউয়াল নয়ান দামেশকের শহরবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানের চুক্তি দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু শহরে ঢুকেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে দেয়। সে-সময় শহরটির শাসক ছিলেন আন-নাসির ইউসুফ আল-আইয়ুবি। দামেশক দখলের পর মোঙ্গলরা শামের দক্ষিণ দিকের

শহরগুলোকে টার্গেট করে এগিয়ে যায়। দখল করে নেয় গাজা, বাইতুল মাকদিস, কির্ক এবং শোবাক নগরী।

মিশর আক্রমণ এবং ইতিহাসের সূচনা

মোঙ্গলদের ভয়ে সিরিয়া থেকে পালিয়ে তখন আক্রান্ত জনপদগুলি থেকে দলে দলে মানুষ আশ্রয় নিচ্ছিল মিশরে। এদিকে হালাকু খানের পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল মিশর দখল করা। কেননা তখনকার সময়ে মিশর জয় করার অর্থ ছিল সমগ্র উত্তর আফ্রিকা জয় করে ফেলা। আর উত্তর আফ্রিকা থেকে জিব্রাল্টার হয়ে একবার স্পেনে ঢুকতে পারলে নিমিষেই ইউরোপকে পদানত করা যাবে। সেটি করতে পারলেই পূর্ণ হবে পিতামহ চেঙ্গিসের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। তাই মোঙ্গলদের পিতামহের স্বপ্নপূরণে তখন একমাত্র বাধা মিশর।

মিশরে তখন শাসন চলছে মামলুক সাম্রাজ্যের। মসনদে বসে আছেন ১৫ বছর বয়সী তরুণ শাসক মানসুর নুরুদ্দিন আলি। বাহরি মামালিকের শাসক সাইফুদ্দিন কুতুয তরুণ অনভিজ্ঞ মানসুরকে সরিয়ে আমির-অমাত্যদের পরামর্শে মিশরের ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিলেন। মোঙ্গলদের অব্যাহত আক্রমণ এবং ক্রমশ মামলুকদের দিকে ধেয়ে আসা বিপদ ঠেকাতে এ সিদ্ধান্তের কোনো বিকল্প ছিল না। মিশরে তখন মুসলমানদের মানসিক অবস্থা একেবারে নড়বড়ে। সাইফুদ্দিন বুঝতে পারছিলেন, এমনটা বহাল থাকলে অপরাজেয় মোঙ্গলদের মোকাবেলা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। তাই ক্ষমতায় বসেই তিনি সকলের মনোবল ফিরিয়ে আনার সর্বোচ্চ চেষ্টা করলেন। বিলাদ-আশ-শামের সকল প্রতিপক্ষকে বিভিন্ন কায়দায় এক মঞ্চে এনে বসালেন। এসময় তার মতের পক্ষে একমত হয়ে তার সঙ্গে জোট করলেন ইসলামি ইতিহাসের আরেক নক্ষত্র রুকনুদ্দিন বাইবার্স আল-বান্দুকদারি। পরবর্তী সময়ে তাতারদের মোকাবেলায় যার রয়েছে নানান বীরত্বের গল্পকথা।

কুতুযের প্রতি হালাকুর চিঠি

সিরিয়া থেকে মিশর আক্রমণের পূর্বে হালাকু খান মোঙ্গলদের স্বভাবসুলভ 'হয় আত্মসমর্পণ, নয় ভয়াবহ মৃত্যু'—এই হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠাল মিশর-সুলতানের কাছে। সেই চিঠিটির চুম্বকাংশ পাঠকের জন্য তুলে ধরছি, যাতে বোঝা যায়,

মোঙ্গলদের হুমকি আসলে কতটা 'পিলে চমকানো' হতো।

আমাদের তরবারির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া মিশরের মামলুক সুলতান কুতুযের প্রতি পূর্ব ও পশ্চিমের সকল রাজার রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি হালাকু খানের ফরমান—

'অন্যদেশগুলোর ভাগ্যে কী ঘটেছিল, তোমার সেটা চিন্তা করে আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত। তুমি শুনেছ, কীভাবে আমরা বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেছি এবং বিশৃঙ্খলাময় দূষিত পৃথিবীকে পরিশুদ্ধ করেছি। আমরা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জয় করে সেখানকার সব মানুষকে হত্যা করেছি। তাই আমাদের আতংকের হাত থেকে তুমিও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না, মনে রেখো।

তুমি কোথায় লুকাবে? কোন রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যাবে? আমাদের ঘোড়াগুলো যেমন তেজি, আমাদের শরগুলোও তেমন তীক্ষ্ণ। আমাদের তরবারিগুলো বজ্রের মতো আর আমাদের হৃদয় পর্বতের মতো শক্ত। মরুবালুকার মতো আমাদের সৈন্যসংখ্যাও গুনে শেষ করার উপায় নেই। না কোনো দুর্গ আমাদের আটকাতে পারবে, না কোনো সৈন্যদল পারবে আমাদের রুখতে। তোমার আল্লাহর কাছে তোমাদের ফরিয়াদ আমাদের বিরুদ্ধে কোনো কাজেই আসবে না—লিখে নাও। কোনো শোকের মাতম আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারবে না, না কারও অশ্রু গলাতে পারবে আমাদের মন। শুধু যারা প্রাণভিক্ষা চাইবে, তারাই আমাদের হাত থেকে বাঁচতে পারবে।

যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আগেই তোমার উত্তর পাঠিয়ে দিয়ো। কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে তার ফল হবে ভয়ঙ্করতম। আমরা তোমাদের মসজিদগুলো ভেঙে চুরমার করে ফেলব আর তোমাদের রবের দুর্বলতা সবার সমানে প্রকাশ করে দেব। তারপর তোমাদের শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করব। মনে রেখো, এই মুহূর্তে তোমরাই আমাদের একমাত্র শত্রু।'

সাইফুদ্দিন কুতুয ভালভাবেই জানতেন, ইতিপূর্বে যারা বিনা যুদ্ধে মোঙ্গলদের ভয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল, তাদের কী করুণ পরিণতি হয়েছিল। তাই কাপুরুষের মতো বিনা যুদ্ধে অপমানের সাথে মারা পড়ার চেয়ে তিনি চাইলেন এই বর্বর বাহিনীকে মোকাবেলা করতে। তাই হালাকু খানকে ক্রোধে অন্ধ করে দিতে সাইফুদ্দিন কুতুয তার চিঠির দারুণ জবাব দিলেন। তিনি হালাকুর দূতের শিরশ্ছেদ করে সেটাকে কাপড়ে মুড়িয়ে হালাকুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পরবর্তী পদক্ষেপ

যুদ্ধ অবধারিত জেনে সাইফুদ্দিন কুতুয সাম্রাজ্যের নেতাদের ডেকে একত্র করলেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন মিশরের প্রধান ইসলামিক স্কলার শেখ ইজ্জউদ্দিন আব্দুস সালাম । তিনি তার বক্তব্যে সুপষ্টভাবে সুলতান কুতুযের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেন এবং নেতাদের সকলকে কুতুযের সাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান করলেন। কিন্তু নেতারা কুতুযের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে সম্মত হলো না। তারা উল্টো মোঙ্গলদের মোকাবেলার এই দুঃসাহসকে আত্মহত্যা হিসেবে ধরে নিয়ে একবাক্যে এর বিরোধিতা করল।

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয তাদের এমন কাপুরুষতা দেখে দুঃখ পেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন: 'হে মুসলমানদের আমির-উমারাগণ, একটা দীর্ঘসময় তোমরা বাইতুল মালের সম্পদ ভক্ষণ করে এসেছ। আর আজকে সেই সাম্রাজ্য বাঁচানোর যুদ্ধে যেতে তোমাদের এত অনীহা? আমি যাচ্ছি যুদ্ধে। কেউ চাইলে এ জিহাদে আমার সঙ্গী হতে পারো, আর কেউ চাইলে তার বাসগৃহে ফিরে যেতে পারো। তবে সে যেন মনে রাখে, আল্লাহ তার ব্যাপারে সম্যক জানেন। অগ্রগামী মুসলমানদের কোনো ভুল, পেছনে বসে থাকা ভীতুদের ঘাড়ে গিয়েও বর্তাবে।'

সুলতান তার বক্তৃতা শেষ করতেই সেখানে হাজির হলেন সারিমুদ্দিন আযবেক ইবনু আবদুল্লাহ আল-আশরাফি। শামে মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি হালাকুর বাহিনীর হাতে বন্দি হয়েছিলেন। এরপর মুক্ত হয়েই তার সামান্য যা সেনা-সম্পদ, তা নিয়ে মিশরে মুসলমানদের যুদ্ধের কাতারে শরিক হতে চলে এসেছেন এখানে। তাকে দেকে সাইফুদ্দিন কুতুযের প্রেরণা বেড়ে গেল। রুকনুদ্দিন বাইবার্স এবং সারিমুদ্দিন আযবেককে সাথে পেয়ে তিনি বিজয়ের ব্যাপারে আরও খানিকটা আশাবাদী হয়ে উঠলেন।

ক্রুসেডারদের অবস্থান

নিজেদের শক্তির ভার আরও ভারী করে তুলতে মোঙ্গলদের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি কিতবুগা নয়ান নাসতুরি বাইতুল মাকদিসের ক্রুসেড সাম্রাজ্যে মৈত্রী-আহ্বান জানিয়ে একটি পত্র পাঠায়। কিন্তু খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের প্রধান পোপ সাফ জানিয়ে

দেয়, মোঙ্গলদের সঙ্গ দেয়া এবং তাদের সাথে কোন মৈত্রী চুক্তি করা আমাদের জন্য ধর্মীয়ভাবে অবৈধ। এদিকে সিডনে ঘটে গেছে আরেক দুর্ঘটনা। কিতবুগার এক চাচাতো ভাইকে ক্রুসেড ফোর্সের অশ্বারোহীরা হত্যা করে ফেলেছে। ফলে মৈত্রীর চিন্তা পশ্চাতে ফেলে কিতবুগা চলে গেছে সিডনে। চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধে অন্ধ হয়ে সে সিডনে ধ্বংসযজ্ঞের অবতারণা করেছে।

মোঙ্গলরা যখন সিডনে খ্রিস্টান নিধনে ব্যস্ত, তখন মিশরের সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয একরের ক্রুসেডারদের সাথে শান্তিচুক্তি সেরে নিয়েছে। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মিশরীয়দের এ যুদ্ধ শতভাগ সফল করতে তিনি তাদের অধিকৃত ভূমি ব্যবহারের অনুমতি চাইলে তারা তার দাবি-দাওয়া মেনে নিয়েছে। তিনি দাবি করেছেন, মোঙ্গলদের সাথে মিশরীয়দের এ যুদ্ধে তারা যেন নিরপেক্ষ থাকে। যদি পেছন থেকে তাদের কোনো ঘোড়া বা কোনো সেনা মুসলিম বাহিনীর কাউকে কষ্ট দেয়ার সামান্য চেষ্টা বা চিন্তা করে, তাহলে মোঙ্গলদের সাক্ষাত করার আগে মিশরের সেনারা খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করবে আগে—এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয। খ্রিস্টানরাও বুঝতে পারে, এটা সময়ের দাবি। মুসলমানরা যদি তাদের কোনো সহযোগিতায় সর্বগ্রাসী মোঙ্গলদের নখর উপড়ে দিতে পারে, তাহলে তা দিনশেষে সকলের জন্যই উপকারী বটে। তাই তারা কুতুযের পথ আগলে না দাঁড়িয়ে পরোক্ষভাবে তাকে সমর্থন জোগাল। পরবর্তীতে তারা তাদের প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেছিল। মুসলিম বাহিনীর পেছনে স্বভাবসুলভ কোন কূটচাল সেবার তারা করার চেষ্টা করেনি।

মোঙ্গলদের যুদ্ধকৌশলে কুতুযের কৌশল

দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনীর মূল শক্তি ছিল তাদের সেনাদের ক্ষিপ্রতা এবং দ্রুতগামী ঘোড়াগুলো। এছাড়া চলন্ত ঘোড়ার উপর থেকে তির ছুড়ে মারার বিশেষ দক্ষতা ছিল তাদের, যা তৎসময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার অন্য সেনাবাহিনীগুলোর ছিল না। মোঙ্গলদের ধনুকগুলো হতো হালকা কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী। ফলে ঘোড়ার উপর চড়েও সহজেই সেগুলো নাড়ানো, বহন করা এবং ব্যবহার করা সম্ভব হতো।

মোঙ্গলরাদের আরেকটি স্ট্র্যাটেজি ছিল—পরপর অনেকগুলো সারিতে বিন্যস্ত না হয়ে ময়দানের ব্যাপ্তি হিসেবে যতটা সম্ভব পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হামলা চালানো, যাতে সুযোগ বুঝে শত্রু বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা যায়।

সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয মিশরের সমরবিদদের সাথে মোঙ্গলদের স্ট্রাটেজিক মাইন্ডের উপর গবেষণা করে বুঝতে পারলেন, চওড়া প্রান্তরে মোঙ্গলদের মুখোমুখি হওয়া মানে সাক্ষাৎ ধ্বংস ঢেকে আনা। তাই তিনি মোঙ্গলদের আগে যুদ্ধ ক্ষেত্র পছন্দ করার সুযোগই দিতে চাইলেন না, বরং সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাবেন তাদের মোকাবেলা করার জন্য এবং যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেন ফিলিস্তিনের তাবারিয়ার ঐতিহাসিক আইন জালুত প্রান্তর।

আইন জালুত প্রান্তরটি এর আগে থেকেই ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত ছিল। কারণ, ওল্ড টেস্টামেন্টে ডেভিড ও গোলিয়াথের যে যুদ্ধের কথা বলা আছে, সেটাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই আইন জালুত প্রান্তরেই।

যুদ্ধের জন্য যাত্রা

১৫ই শাবান ৬৫৮ হিজরি। মিশরের সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয কায়রোর আল-জাবাল দুর্গ থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখে চলছেন। তার সামনে আছেন কিংবদন্তি সেনাপতি রুকনুদ্দিন বাইবার্স। সাথে আছে মিশর, শাম, আরব এবং তুর্কমানের সম্মিলিত সেনাদল। গাজায় তখন অবস্থান করছে কিতবুগার ভাই বাইদার। কিতবুগা তাকে পত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, মিশরের বাহিনী আসছে। বাইবার্স সেখানে পৌঁছে গাজার কাছেই একটি উপত্যকায় বাইদারের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মুসলিম বাহিনী গাজা হয়ে সমুদ্রবর্তী পথ ধরে উত্তর ফিলিস্তিনের দিকে চলতে শুরু করে।

এ সময় কিতবুগা ছিল বালবেক শহরে। সে হিমসসহ আশপাশের নেতাদেরকে একত্র করে কী করা যায় মর্মে পরামর্শ চাইল। তাদের কেউ কেউ বলল, হালাকু খান আসা পর্যন্ত আমরা আপনার সামরিক কোনো সফলতা দেখছি না। আবার কেউ বলল, আপনার সেনাদল অপরাজেয় এবং অসংখ্য; আমাদের মনে হয়, আপনার যুদ্ধে নেমে যাওয়া উচিত, বিজয় আপনার সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় পক্ষের কথায় কিতবুগা সম্মতি জানিয়ে বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য বের হয়ে গেল। কিতবুগার গোয়েন্দাদের দিকভ্রান্ত করে সাইফুদ্দিন পূর্বপরিকল্পনা মতো মোঙ্গলদের নিয়ে এলেন আইন জালুতের ময়দানে।

আক্রমণ

২৫শে রমাদান, ৬৫৮ হিজরি সন। ফিলিস্তিনের আইন জালুতে উভয় বাহিনী তখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুয তাঁর বাহিনীকে সাজাতে লাগলেন। বাইবার্সের নেতৃত্বে একদল সিরীয় সেনা রাখলেন সম্মুখভাগে। বাকি সেনাদের পার্শ্ববর্তী টিলার পেছনে লুকিয়ে রাখলেন এবং নিজে একাংশ সেনা নিয়ে পেছনের উপত্যকার ওপাশে অবস্থান নিলেন। এরপর সেনাপতিদের সামনে ডেকে এনে তিনি তাদেরকে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোবল ধরে রাখার উপদেশ দিলেন। অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলে মোঙ্গলদের চালানো তাণ্ডবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদেরকে কাপুরুষতার পরিণতি বোঝালেন। বললেন, আগুনে জ্বলে, শূলিতে চড়ে বা লাঞ্ছিত হয়ে মরতে না চাইলে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে আজকে তোমাদের বিজয় ছাড়া উপায় নেই। শাম, ফিলিস্তিন এবং মিশরকে হালাকুর হাত থেকে বাঁচানোর গুরুত্বের কথা জানালেন। সকলে তার কথায় কান্নায় ভেঙে পড়ল। পরস্পরে চুক্তি ও একতাবদ্ধ হয়ে মোঙ্গলদের পরাজিত করে নিজেদের ভূমি থেকে চিরতরে তাড়ানোর প্রতিশ্রুতি নিল।

কুতুয শুরুতেই তার সব সৈন্যদের দিয়ে শক্ত আক্রমণ করালেন না, বরং প্রথমে ছোট একটি দল পাঠিয়ে মোঙ্গল বাহিনীকে প্ররোচিত করলেন। তাছাড়া তিনি জানতেন, তার সিরীয় সৈন্যরা আগেও একবার মোঙ্গলদের কাছে হেরে পালিয়ে এসেছে। তাই বিপদে পড়লে এরা আবারও পালাতে পারে এটা মাথায় রেখে পরিস্থিতি যত খারাপ হোক, যেন তারা পালাতে না পারে সেজন্য এদেরকে রাখলেন সবার সামনে।

শুরুতে মোঙ্গলদের প্রবল আক্রমণের মুখে কুতুযের সৈন্যদের অবস্থা ছিল টালমাটাল। বাইবার্সের সম্মুখ দল অনেকটা পেছনের দিকে সরে আসতে বাধ্য হলো। এ-সময় পূর্বপরিকল্পিত ফাঁদে মোঙ্গলরা আটকে গেল ধীরে ধীরে। উপত্যকার ওপাশে আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে ছিলেন সাইফুদ্দিন কুতুযের বাহিনী। ওদিকে টিলার পেছনে বসে আছে আরেকদল এলিট ফোর্স। বাইবার্স ইচ্ছে করে পেছন দিকে সরতে সরতে মোঙ্গলদেরকে ফাঁদে এনে ফেললেন। অমনি কুতুয তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসলেন। মোঙ্গলরা সিরীয় সৈন্যদের ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করার সাথেসাথে মুখোমুখি হল কুতুযের এলিট বাহিনীর। এদিকে সামনের সারির সিরীয় সৈন্যদের জন্য তাঁরা পিছিয়েও আসতে পারছিল না। তখনই টিলার দুই পাশ থেকে মোঙ্গলদের উপর নেমে আসল তিরবৃষ্টি। কিন্তু মোঙ্গলরা মুসলমানদের

আক্রমণ সামলে নিয়ে পাল্টা শক্ত হামলা করল মুসলিম বাহিনীর সম্মুখভাগে। কিতবুগার স্পেশাল ফোর্সের ভয়াবহ আক্রমণে মুসলমানদের বাম অংশ ভেঙে পড়ল। কিন্তু কেন্দ্র এবং ডান অংশ তখনো ময়দানে আছে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সুলতান কুতুয নিজের শিরস্ত্রাণ খুলে উঁচু জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে 'ওয়া ইসলামাহ!' বা 'হায় ইসলাম! হায় ইসলাম!'—বলে সৈন্যদের সাহস জোগালেন এবং সকলকে দেখিয়ে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যাতে সুলতানের দেখাদেখি অন্যরাও আক্রমণের মনোবল ফিরে পায়।

এদিকে আইন জালুতের প্রান্তরটি সরু হওয়ায় মোঙ্গলরা তাদের পুরনো এবং চিরাচরিত কোনো কৌশল অবলম্বন করতে পারল না। ফলে মুসলমানদের সম্মিলিত আক্রমণে তাদের সেনারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালাতে শুরু করল। সামান্য সময়ের মধ্যেই ময়দান থেকে অধিকাংশ সেনারা পালিয়ে যেতে শুরু করলে কোনো কোনো মোঙ্গল সেনাপতি কিতবুগাকেও পালানোর পরামর্শ দেয়। কিন্তু সে বলে, 'আমি পরাজয়ের লাঞ্ছনা নিয়ে পালানোর লোক নই।' অল্প কিছু সেনা নিয়ে সে সামনে এগিয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে, আরিনান নামক এক মুসলিম সেনার সাথে এ-সময় কিতবুগার মোকাবেলা হয় এবং অল্প সময় পরেই পরাজিত হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর আরিনান কিতবুগার ধড় থেকে শির তুলে নেয়। সেনাপতির পরিণতি দেখেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে মোঙ্গল সেনাবাহিনী। পালিয়ে যেতে থাকে দিগ্বিদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে। কুতুযের সৈন্যরা প্রায় ৬০০ কিলোমিটার তাড়িয়ে শেষ মোঙ্গল সৈন্যটিকেও হত্যা করে আসে। এভাবেই মামলুক সৈন্যদের কাছে পরাজয় ঘটে অহংকারী, বর্বর ও জালিম হালাকু বাহিনীর। নিমিষেই চূর্ণ হয়ে যায় তাঁদের আকাশছোঁয়া দম্ভ এবং ইতিহাসে মুসলমানদের নামে অঙ্কিত হয় এক যুগান্তকারী বিজয়।

কেন আইন জালুতের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ

পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই শাম ছেড়ে পালায় মোঙ্গলদের সকল সেনা। সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সকে তাদের পেছনে পাঠান। আলেপ্পোর ভূমি পর্যন্ত তিনি দাবড়ে বেড়ান মোঙ্গলদের। এদিকে ২৭শে রমাদান সাইফুদ্দিন কুতুয দামেশকে প্রবেশ করেন। সেখানকার যাবতীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন। প্রশাসনিক অবকাঠামো মজবুত করে যোগ্য লোকদের নেতৃত্বের আসনে

বসান। হিমসের অধিপতি আশরাফ নিরাপত্তা চাইলে তিনি তাকে হিমস ফিরিয়ে দেন। ইতিপূর্বে হালাকু খান তাকে হিমসের দায়িত্বে বহাল রেখেছিল। মানসুরকে তিনি হামা নগরী বুঝিয়ে দেন, সাথে মাআররা ও তার আশপাশের এলাকাগুলোও তার অধিকারে যোগ করে দেন।

মোটকথা, আইন জালুতে মোঙ্গলদের পরাজয়ে শামের রাজ্যগুলো সংহত হয়ে ওঠে এবং সাম্রাজ্যের গ্রোথগুলো মামলুকদের অধীনে একত্র হয়ে যায়, যা উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থানের আগ পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় ২৭০ বছর টিকে ছিল।

ওদিকে ঐতিহাসিকরা বলেন, মোঙ্গলরা তাদের অসুস্থ উত্থানের পর থেকে আইন জালুতের আগে কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হয়নি। তবে এ ঘটনার পর শাম পুনরুদ্ধারে একবার সে তার ছেলে ইয়াশমুতকে প্রেরণ করেছিল। কিন্তু সেবার তার চিন্তা ও চেষ্টা পুরোপুরি নিষ্ফল হয়ে যায়। তারা শামের কোথাও গোপনে আনন্দভোজ করছিল, এমন সময় বাইবার্সের বাহিনী তাদের খোঁজ পেয়ে সেখানে পৌঁছে দেখে, সবকটা মাতাল হয়ে পড়ে আছে। দেরি না করে আলগোছে সবগুলোর মাথা কেটে ফেলে তারা; তবে মাত্র কয়েকজনকে বাঁচিয়ে রাখে হালাকুর কাছে সংবাদ পৌঁছে দেবার জন্য। এরপর হালাকুর ছেলের মাথা কেটে সেটা তার জন্য হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করে। এই পরাজয়ের সংবাদ এবং নিজের ছেলের কর্তিত মস্তক হালাকুর সামনে হাজির করা হলে বেঁচে ফেরা সেনাদের সবকটাকে হালাকু জবাই করে দেয়।

আইনজালুতের ঐতিহাসিক প্রান্তরে অবসান হয় মোঙ্গলদের অপরাজেয় মিথের। তাদের ভয়ে স্বদেশ থেকে পালাতে থাকা হাজার হাজার মানুষ একে একে আবার স্বদেশে ফিরে আসতে শুরু করে। এই পরাজয়ের পরও মোঙ্গলরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল; কিন্তু আর কখনোই আগের মতো দুর্জেয় মনোবল ফিরে পায়নি। শুধু মধ্যপ্রাচ্যের বিবেচনায় নয়, বরং পুরো পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর মধ্যে একটি এই আইন জালুতের যুদ্ধ। কেননা এই যুদ্ধে সুলতান কুতুয হেরে গেলে উত্তর আফ্রিকা, স্পেন ও ইউরোপ পরিণত হত বাগদাদ, সমরখন্দ ও বেইজিং এর মত বধ্যভূমিতে। আদৌ মানব সভ্যতার ঐ ক্ষত সেরে উঠত কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই। তবে বর্বর মোঙ্গল বাহিনীকে রুখে দেওয়ার অনন্য কীর্তির প্রতিদান হিসাবে যে বিশ্ববাসী চিরকাল সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুযকে মনে রাখবে, সেটা বলে দেওয়া যায় নিঃসন্দেহে।